This Book Downloaded From
http://doridro.com

শেষ রাত থেকেই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টি নিঃশব্দ। অনেকটা শিশিরপাতেরই মতন।

ঘুম ভাঙার পর অনেকে এরকম বৃষ্টি দেখে বিরক্ত হয়। নানারকম কাজকর্ম আছে, সংসারের চাকা গড়াতে শুরু করবে, তার মধ্যে আবার এই বৃষ্টি। শীতকালের বৃষ্টি, এর কয়েক ফোঁটা মাথায় জমে থাকলেই জ্বর হবে নির্ঘাৎ। ছাতা নিয়ে বেরুতে হবে, প্রত্যেকেরই একবার না একবার ছাতা হারায়।

আবার অনেকেরই সবসময় বৃষ্টি ভাল লাগে। চোখ মেলে জানলার বাইরের মৃদু বর্ষণ দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বাথরুমে যাওয়ার আগে জানলার কাছে দাঁড়ায়। গাছপালাগুলো পরম আরামে ভিজছে, পুকুরের জলে অজস্র যুঁইফুল। রাস্তা দিয়ে শুরু হয়ে গেছে মানুষের চলাচল। কেউ হাঁটছে দৌড়াবার ভঙ্গিতে, কেউ ধীর পায়ে। কুমারী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিয়েছে, পুরুষেরা কেউ কেউ ছাতা খুঁজে না পেয়ে মাথায়

বেঁধেছে কমাল। কেউ কেউ গান গাইছে মনে মনে।

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই সব মানুষের কাছে এক নয়।

অনেকে পায়ের তলায় মাটিটাও চেনে না। কেউ কেউ গাছের দিকে তাকিয়ে ফুল কিংবা ফল খোঁজে, কেউ কেউ দেখে পুরো গাছটা। যখন হাওয়া দেয়, তখন গাছের সব পাতা একরকম দোলে না, দু'একটি পাতায় থাকে বেশি চঞ্চলতা। এক একটি দুরন্ত শিশু যেমন ঘুমের সময়েও জেগে ছটফট করে, তেমনি এক একটি গাছের পাতা শান্ত, নিবাত, নিষ্কম্প সময়েও একা একা নাচে। কিছু কিছু মানুষই শুধু তা দেখতে পায়।

অনেকের কাছে জীবন একটা সোজা রাস্তা, শুধু মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হয়। অনেকের কাছে সাপ-লুডোর মতন। কেউ কেউ সারা জীবনই গোলোকধাঁধায় ঘোরে। অনেকে, এ জীবন লইয়া আমি কী করিব, এই চিন্তাও করে না। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বেঁচে থাকাটাই জীবন।

চন্দন বৃষ্টি-প্রেমিকদের দলে। তার প্রেমটা বেশি বেশির পর্যায়ে পড়ে।

বছরের যে-কোনও সময় বৃষ্টি পড়ুক, সে একটু না একটু ভিজবেই স্বেচ্ছায়। তারও মাঝে মাঝে জ্বর হয়, তবু শিক্ষা হয় না।

শীতকালে শিয়রের জানলাটা বাধ্য হয়ে বন্ধ রাখতে হয়, কিন্তু সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে সে ঘুমোতে পারে না। পাশের একটা খোলা জানলা দিয়ে মিহিন বৃষ্টিময় হাওয়া কয়েকবার তার মুখে লাগতেই তার ঘুম ভাঙলো। মাত্র কিছুদিন হলো, এই ঘরটা তার একার। তার মেজদা সদ্য কানপুরে বদলি হয়ে গেছে, এটা তার অধিকারের ঘর, চন্দনকে শুতে হতো তার বাবার সঙ্গে, আলাদা খাটে।

আরও আধঘণ্টা ঘুমোলে কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বৃষ্টি পড়লে চন্দন বিছানায় শুয়ে থাকবে কী করে? তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল, পা-জামার আদগা দড়িটা এক হাতে মুঠো করে ধরা। সে খুলে দিল শিয়রের জানলা। পাশের দিকের জানলাটা দিয়ে শুধু কাছের একটা হলুদ রঙের তিনতলা বাড়ি দেখা যায়, অন্য জানলায় তবু একটা দৃশ্য আছে। একটা মজা পুকুর, তার ওপাশে সরু পায়ে চলা সুরকির পথ, তারও ওপাশে একটা কলাবাগান। ঠিক এগারোটা কলাগাছ। যার জমি, সে এসব গাছের কলা বিক্রি করে, না সারা বছর ধরে নিজেরাই খায়, তা চন্দন জানে না। সব সময়ই কোনও না কোনও গাছে কলার কাঁদি ঝোলে।

পুকুরটা তৃষ্ণার্তের মতন বৃষ্টির জল খাচ্ছে। ভরা বর্ষাতেও এ পুকুরটা পুরো ভরে না, এইটুকু বৃষ্টিতে আর কতটা তৃষ্ণা মিটবে। এক কোণে কয়েকটা শালুক ফুল ফুটে আছে, গতকালও এই ফুলগুলো ছিল না।

শালুকগুলোর চেয়েও চন্দনের বেশি ভাল লাগল কলাগাছের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জলের ফোঁটা। পৃথিবীতে আর কোনও গাছের পাতা কি কলাপাতার মতন এমন বড় হয়। কে জানে। তালপাতা কিংবা খেজুরগাছের পাতাও যেন ঠিক পাতা নয়, এক একটা ডাল, কিন্তু কলাপাতাগুলো যেন ঠিক নারীর মতন কমনীয়। কী নরম, কী মসৃণ, বৃষ্টির ফোঁটায় ভারি সুন্দর মানিয়েছে।

এক কাঁদি কলা হবার পরই গাছটাকে কেটে ফেলতে হয়। ওই বাগানের মালিক গৌরবাবুকে নিজের হাতে কলাগাছ কাটতে দেখেছে চন্দন। এক গাছে নাকি দু'বার কলা ফলে না। কী অদ্ভুত ভাগ্য এই গাছের, ফল ফলালেই জীবন দিতে হবে। এখন এই মুহূর্তে বৃষ্টির মুক্তোমালায় কলাগাছগুলো চমৎকার সেজে আছে।

কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শীত করছে চন্দনের। তার গায়ে শুধু গেঞ্জি। কিন্তু সে শীত গ্রাহ্য করল না, পাজামার দড়িটা শক্ত করে বেঁধে সে চলে এল ছাদে।

চন্দন দে সরকার, বয়েস ছেত্রিশ, দো-হারা চেহারা, ছাদে দাঁড়িয়ে শীতের বৃষ্টিতে ভিজছে। এখন তার বাবা ছাড়া বাড়ির অন্য কেউ তাকে এই অবস্থায় দেখলেও গ্রাহ্য করবে না, সবাই তার এই স্বভাবের কথা জানে। একমাত্র বাবা তাঁর এই ছেলেটিকে বকুনি দিয়েও এই স্বভাব ছাড়াতে পারেননি, তবু তিনি বকুনি দেওয়া ছাড়েননি। তিনি অবশ্য এখনও ঘুমোচ্ছেন। তাঁর কাছে বৃষ্টির চেয়ে ঘুমের আরাম অনেক বেশি উপভোগ্য।

এই সব সকালে সূর্য দেখা যায় না, তবু একটা চাপা আলো থাকে। শীতের রোদ্দুর সকলেরই প্রিয়, শুধু চন্দন এই আলোটা বেশি পছন্দ করে। বৃষ্টির সময় আকাশ অদৃশ্য হয়ে থাকে, প্রত্যেকদিন দিনের বেলা কেন আকাশ দেখা যাবে, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে থাকা তো ভালই।

একটা নিভৃত ঘরের মধ্যে যেমন তুমি আর আমি, সেইরকমই এখন শুধু বৃষ্টি আর পৃথিবী।

এখন আকাশ নেই, মহাশূন্য নেই। এখন ভালবাসাবাসি চলছে।

ওপর থেকে ধারাবর্ষণের মতন এমন অলৌকিক ব্যাপার কি আর কিছু আছে? এক দু'বছর যদি সারা পৃথিবীতে এক ফোঁটাও বৃষ্টি না হয়, মনুষ্য জীবন শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত জীবনের চিহ্নও লোপ পাবে। তাই না? চন্দন সে কথা ভাবে না। বৃষ্টির ফোঁটা তার মাথা থেকে ঘাড়ে, গলায়, বুকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামে, তার শিহরন হয়। এইরকম সময় তার পুরুষাঙ্গটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পা-জামা ভেদ করে বাইরে আসতে চায়।

চন্দন এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কলাপাতার ওপর বৃষ্টিবিন্দুগুলির দিকে। যেন এরকম রূপের বিভা সে আর কখনও দেখেনি।

এই যে দাঁড়িয়ে থাকা, এই যে চেয়ে থাকা, এর যেন আদি-কিংবা অন্ত নেই। এ যেন স্তব্ধ চির মুহূর্ত। এখন পৃথিবীতে আর কিছু নেই, শুধু এই তেত্রিশ বছর বয়স্ক যুবা, আর আন্দোলিত কলাপাতার সৌন্দর্য।

এত ভাল লাগায় চন্দনের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

দুই

অনেকের কাছেই চন্দন নামের ছেলেটা ঠিক সুস্থ, স্বাভাবিক নয়। সে ঠিক পাগল না হলেও মনোরোগী, উদভ্রান্ত, লক্ষহীন। সেই জন্যই তার জীবনের কোনওরকম সাফল্যের প্রশ্ন নেই, সে গুড ফর নাথিং।

ছেলেটা? সে একজন তেত্রিশ বছরের পূর্ণবয়স্ক মানুষ, তবু তাকে অনেকেই ছেলেটা বলে, কারণ তার দুই দাদা আছে, তারা তথাকথিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তাদের জীবনের একটা পথ বাঁধা হয়ে গেছে। চন্দন বিয়ে করেনি, কিংবা তার বিয়ে হয়নি, তাই শুধু বাড়ির মানুষ নয়, পাড়ায় লোকের মুখে মুখেও সে 'ছেলেটা', তাকে সবাই অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে। সে কারও ক্ষতি করে না, তবু তার অসার্থকতা অন্যদের পীড়া দেয়।

চন্দনের অস্বাভাবিকতার প্রধান লক্ষণ, সে কোনও কিছুই সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায় না, সে একটা অংশের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে। সে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তখন অনেক কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, চেনা লোকদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও তার দৃষ্টি শূন্য থাকে, কেউ ডেকে কথা না বললে সে চুপ করে পাশ দিয়ে চলে যায়, যেন একটা কিছু সে দেখেছে। তাই নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সেই একটা জিনিসই তার কাছে যথেষ্ট। রিক্সাওয়ালার পা কিংবা স্কুল বালকের নাচের ভঙ্গিতে ছুটে যাওয়া, কিংবা কোনও রমণীর ধুলো-ছোঁওয়া আঁচল।

চন্দনের এই সব লক্ষণ অল্প বয়েস থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

হুলো বেড়ালটার কথাই ধরা যাক। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, সবাইকে এই ঘটনাটা শোনাতেন বার বার।

হুলো বেড়ালটা কারওই পোষা নয়, পাড়ার সবাই সেটাকে দুর দুর ছাই ছাই করে, যে-বাড়িতে ঢুকবে, সেখান থেকেই তাড়া খাবে। তবু কী আশ্চর্য, সেটা দিব্যি বেঁচে আছে, রীতিমতন গাট্টাগোট্টা, গলার আওয়াজ মাস্তানদের মতন। সামান্য একটা প্রাণী হয়েও এই পল্লীর সমস্ত লোকের অপছন্দের সঙ্গে সে টক্কর দেয় দাপটের সঙ্গে।

চন্দন বেড়াল পছন্দ করে না। কোনও জানোয়ার বা পাখি-টাখি পোষার দিকেও তার ঝোঁক নেই। সাত-আট বছর বয়েস থেকেই সে অন্যদের শিক্ষা মতন হুলোটাকে দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। তবু, তার যখন এগারো বছর বয়েস, একদিন রান্নাঘরে হঠাৎ ঢুকেই চন্দন দেখেছিল, এক কড়াই দুধে মুখ ডুবিয়ে হুলো বেড়ালটা চক চক করে খাচ্ছে। চন্দনকে দেখেও বেড়ালটা পালিয়ে না গিয়ে শুধু একবার চন্দনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

বেড়াল কি মানুষকে সম্মোহিত করতে পারে? বেড়ালটার দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে, অনেকগুলি অনুভূতির মিশ্রণ, যা চন্দন আগে কখনও দেখেনি। একটা গভীর বিস্ময়বোধে সে স্থির হয়ে গেল। এক

This Book Downloaded From
http://doridro.com

কড়াই দুধ নষ্ট হওয়া কম কথা নয়, চন্দন দুধ দেখছে না, পুরো বেড়ালটাকেও দেখছে না, শুধু তার সেই দৃষ্টি তার চোখের মণির সবুজ আলোয় যেন ঘর ভরে গেছে।

এরই মধ্যে মা এসে পড়লেন রান্নাঘরে। বেড়ালটার চেয়েও তাঁর ছেলেকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বেশি মর্মাহত হলেন। একটা এগারো বছরের ধেড়ে ছেলে বেড়াল তাড়াতে পারে না? হাঁ করে দেখছে?

বেড়ালটা কিন্তু মায়ের দিকে সেই বিশেষ দৃষ্টিটা দিল না। তাঁকে দেখামাত্র এক লাফে জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর বাড়ির সবাই যখন বকাবকি করতে লাগল, বেড়ালটাকে দুধে মুখ দিতে দেখেও চন্দন কেন সেটাকে তাড়ায়নি, তার কোনও ব্যাখ্যা চন্দন দিতে পারল না। ব্যাখ্যা দিতে না পারাটাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। শুধু তার ছোট বোন মুন্নি একবার বলল, আহা, বেড়ালে একবার মুখ দিলে সেই দুধ তো আর খাওয়া যায় না..., কিন্তু তার এই যুক্তি কেউ মানল না। এমনকি চন্দনও সেই কথা ভাবেনি। বাকি দুধটা ফেলে দিতে হলেও এই অবস্থায় বেড়ালটার মাথায় জোরে মারতে হয়, যাতে সে ভবিষ্যতে আর দুধ চুরি করতে সাহস না পায়। অবশ্য বেড়ালরা এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত কি না, তা কেউ জানে না।

একজন রিক্সাওয়ালার দু পায়ে দুরকম চটি। এর সাইকেল রিক্সায় চন্দনের ছোট দুই বোন মুন্নি আর বিন্নি রোজ স্কুলে যায়। চন্দন একদিন এর দুরকম চটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এটা সে আগে লক্ষ করেনি কেন? কিংবা গতকাল এরকম ছিল না? তাহলে গতকাল ওর পায়ে কীরকম চটি ছিল, তা তো মনে পড়ছে না, তবে কি ওর পায়ের দিকে আগে কখনও তাকায়নি? রিক্সাওয়ালার শুধু মুখ ও বুকের খানিকটা অংশই সবাই দেখে, এখন চন্দন শুধু দেখে তাদের পা, রাস্তায় যত রিক্সাওয়ালা যায়, চন্দন তাদের চটি কিংবা খালি পা, ফাটা গোড়ালি, কার বিকৃত বুড়ো আঙুল, কার গুল্‌ফে জট পাকানো শিরা, এই সব মনে গেঁথে নেয়।

একদিন মুন্নি বাড়ি ফিরে বলল, মা, ধনিয়ার একটা আমার সমান মেয়ে আছে। আজ দেখলাম।

বারান্দার তার থেকে শুকনো কাপড়-জামা তুলতে তুলতে মা জিজ্ঞেস করলেন, ধনিয়াটা আবার কে?

মুন্নি বলল, আমাদের রিক্সাওয়ালা।

যে-লোকটি দু' বছর ধরে এ বাড়ির দুই মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে ও ফেরত আনছে, তার নাম মা জানেন না। চন্দনও জানত না। সে তখন তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

মুন্নি বলল, সন্তোষদার দোকানের সামনে আজ ধনিয়া সাইকেল রিক্সাটা একবার থামাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে থামলে কেন? ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। ধনিয়া তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলল, আটা কিনে নিয়ে যা। আমি বললাম, এই তোমার মেয়ে বুঝি? ও স্কুলে পড়ে না? ধনিয়া বলল, হ্যাঁ, পড়ালেখা করে। করপোরেশান স্কুলে যায়। ওর নাম গীতা।

মুন্নির তুলনায় বিন্নি কম কথা বলে, সে এবার বলল, রোজ স্কুলে যায় না।

মুন্নি বলল, তুই কী করে জানলি?

বিন্নি বলল, তা হলে ওই সময় দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? আটার ঠোঙা হাতে নিয়ে কেউ স্কুলে যায়?

এই সামান্য কাহিনীতে মা আর কোনও আগ্রহ বোধ করলেন না। জলখাবারের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চন্দন সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইল। দু' পায়ে দুরকম চটি পরে, এমন রিক্সাওয়ালারও দশ বছর বয়েসী মেয়ে থাকে? রিক্সাওয়ালারাও যে কারও বাবা হয়, এই কথাটাই তার কখনও মনে হয়নি। গীতা নামের মেয়েটির পায়েও কি চটি ছিল, না খালি পা? রেল স্টেশনে সে অনেক অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের খালি পা দেখেছে, তাদের বাবারা কে কী করে সে জানে না। এরপর থেকে স্টেশনে যাওয়া-আসার পথে চন্দন সন্তোষদার স্টেশনারি দোকানের সামনে একটুক্ষণ দাঁড়ায়, যদি সেখানে একটি দশ বছরের মেয়েকে দেখা যায়। পুরো মেয়েটি নয়, শুধু তার পা দুটি না দেখলে যেন চন্দনের শান্তি হবে না কিছুতেই।

সম্পূর্ণতার বদলে মাত্র একটা অংশের প্রতি এই ঝোঁকের জন্যই চন্দন জীবনের কোনও ব্যাপারেই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি। সে ঠিক রোগা-ভোগা ছেলে নয়, অল্পবয়েসে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু-আধটু খেলাধুলো করেছে, কিন্তু কোনও খেলাতেই সে প্রথম সারির যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

লেখাপড়াতেও তাই। তাদের বাড়ি পড়াশুনোর বাড়ি। বাবা রেলের বুকিং অফিসের কেরানি ছিলেন, একসময় বেশ অভাবের মধ্যেই সংসার টানতে হয়েছে, তাই তিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। রামমোহনের কঠোর অনুশাসন ছিল, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টার মধ্যে পড়তে বসতে হবে, বিকেলবেলাতেও তাদের বাড়ি ফেরার সময়সীমা ঠিক সাড়ে ছ'টা এবং আবার রাত নিয়ে বসা। রিটায়ার করার পর তিনি কঠোরভাবে পাহারা দিতেন, সেই সময় ছেলেমেয়েদের কোনও বন্ধু-টন্ধু এলে বকুনি খেয়ে ফিরে যেত। সামান্য অবাধ্যপনা কিংবা গাফিলতি দেখলে তিনি নিজের কলেজে পড়া ছেলেদেরও চড়-চাপড় মারতে দ্বিধা করতেন না।

এখন তাঁর বড় ছেলে দিবাকর চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মেজ ছেলে অশনি ইঞ্জিনিয়ার। রামমোহনের ইচ্ছে ছিল ছোট ছেলে ডাক্তার হোক, পরিবারে একজন ডাক্তার থাকা ভাল। কিন্তু চন্দন তাঁকে নিরাশ করেছে। চন্দন ঠিক গবেট বা মাথামোটা নয়, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে অঙ্ক খুব ভাল পারে, সব পরীক্ষাতেই সে অঙ্কে প্রায় পুরো নম্বর পেয়েছে, কিন্তু অন্য কোনও সাবজেক্টে তার মন নেই। ইংরিজি-বাংলায় যেমন তেমন, কিন্তু অঙ্কে যার স্বচ্ছ জ্ঞান, তার অন্তত ফিজিক্স-কেমিস্ট্রিতেও পারদর্শী হওয়ার কথা, সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু চন্দনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার কোনও নিয়মই যে খাটে না। ডাক্তারিতে ভর্তির পরীক্ষায় সে ব্যর্থ হয়েছে, কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে গিয়েও ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যালে এমনই খারাপ করেছে যে সে অনার্স পায়নি, শুধু অঙ্কতে শতকরা পঁচানব্বই নম্বর পেয়েও সে নিছক পাসকোর্সের বি. এস-সি ফিজিক্সেও খারাপ নম্বরের জন্য তার এগ্রিগেট এতই কমে গিয়েছিল যে পিওর ম্যাথামেটিক্স নিয়ে এম. এস-সি পড়ারও সে সুযোগ পায়নি। অর্থাৎ তার পড়াশুনোয় সেখানেই ইতি।

একজন সাধারণ পাসকোর্সের বি. এস-সি কী চাকরি পাবে? সব দরজা তার জন্য বন্ধ। সাড়ে তিন বছর সে বেকার হয়ে বসেছিল বাড়িতে। মজার ব্যাপার এই, তার দুই দাদাই কখনও কখনও কোনও দুরূহ, জটিল অঙ্কের সমস্যায় পড়ে চন্দনের সাহায্য চেয়েছে, চন্দন তার সমাধান করতে একবারও ব্যর্থ হয়নি। অর্থাৎ অন্তত একটি বিষয়ে সে তার দাদাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, অথচ অন্য সকলের চোখে সে প্রায় অশিক্ষিত। ছোট বোন দুটিও পড়াশুনোতে ভাল হয়েছে।

বাবার তাড়নায় চন্দন একসময় টিউশানি করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তো অন্তত উপার্জন চাই। অধিকাংশ ছাত্রই অঙ্কে কাঁচা হয়, তাই শুধু অঙ্কের গৃহশিক্ষকের বেশ চাহিদা আছে। প্রথম বছরের দুটি ছাত্র অঙ্কে ভাল ফল করলে তাদের চেনা অন্য বাড়ি থেকেও চন্দনের ডাক পড়ে।

ছোট ছেলেটির ব্যর্থতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি রামমোহন, মনে মনে গজরাতেন। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি, ছেলেটাও একেবারে বোকা-হাবা নয়, তবু কেন এরকম হল? যাদের অঙ্কে মাথা থাকে, তাদের তো সবাই বেশি বুদ্ধিমান বলে। অথচ এর বাস্তববুদ্ধির আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। যাই হোক, গৃহশিক্ষক হিসেবে চন্দনের জনপ্রিয়তা দেখে তিনি আর একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে ফেললেন। যদি বাড়িতে একটা কোচিং ক্লাস খুলে দেওয়া যায়, তা হলে অঙ্ক পড়তে অনেক ছাত্রই আসবে, তাতে চাকরির থেকে কম রোজগার হবে না। এখন কোচিংক্লাস বেশ ভাল ব্যবসা।

কিন্তু যে অঙ্ক পারে, সে কি ব্যবসাও চালাতে পারে? ব্যবসায়ীরা তো মাইনে করা অঙ্কজানা লোক রাখে, নিজেরা অন্যদিকে সামলায়। বাবার এই প্রস্তাবে বড় দুই ছেলেরই আপত্তি, তাদের ধারণা, বাড়িতে গিয়ে একটি মাত্র ছাত্র বা ছাত্রীকে পড়ানো আর একগাদা ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কোচিংক্লাস চালানো এক কথা নয়। তাদের কাছ থেকে মাইনে আদায় করা, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা, এসব চন্দন পারবে না। এসব তার হাতে নেই তো কী করা যাবে!

তাছাড়া একতলায় বসবার ঘরটি এইভাবে দখল হয়ে যাবে এটাও তাদের পছন্দ নয়। দু' জনই সদ্য বিয়ে করেছে, একই দিনে, এক পরিবারের দুই মেয়েকে। বাড়িতে জায়গার বেশ টানাটানি। ছোট

বোনদের মধ্যে বিন্নি এম এ পড়ার সময় এক সহপাঠীকে বিয়ে করে চলে গেছে দিল্লি, তার স্বামী এখন জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। মুন্নি এখনও বিয়ে করেনি, একটা ব্যর্থ প্রেমের ধাক্কা আছে, সেই ক্ষত শুকোতে সময় লাগবে।

দুই দাদার মধ্যে দিবাকর বরাবরই চন্দনকে ভালবাসে। এই ছোট ভাইটা সব সময় নিজের মনে থাকে, অন্যদের মতন নয়। সবাইকে যে একই রকম হতে হবে, তারই বা কী মানে আছে? ওর খাওয়া পরার কোনওদিনই অভাব হবে না। কোচিং ক্লাসটলাস অতি বাজে ব্যাপার। বিদ্যাদানের নামে ব্যবসা। যেন লেখাপড়ার নার্সিংহোম।

দিবাকরের অন্য প্রস্তাব আছে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই সে চাকরি ছেড়ে নিজস্ব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম খুলবে, তখন চন্দন তাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে।

রামমোহন অবশ্য ছেলেদের আপত্তি গ্রাহ্য করার মতন মানুষ নন। এ বাড়ি তিনি নিজের কষ্টার্জিত রোজগার ও উপরির টাকায় বানিয়েছেন। আগের বছর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, বাড়িতে দুটি পুত্রবধূ এসেছে। তিনি বুঝতে পারছেন, এবারে সংসারের দখল ওই দুই বউদের হাতে চলে যাবে, কিন্তু তিনি সহজে কর্তৃত্ব ছাড়বেন না। ছেলেদের বউদের কাছে হাত তোলা হয়ে থাকতে তিনি রাজি নন। কোচিং ক্লাসের ব্যবসাটি তিনি নিজেই চালাবেন, সেখানে চন্দনও পড়াবে, তিনি অন্য মাস্টারও রাখবেন।

এর মধ্যে একদিন তাঁর হৃৎপিণ্ডে দারুণ কম্পন হওয়ায় বেশ কিছুদিন তাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল, পরিকল্পনাটি ধামাচাপা পড়ে গেল আপাতত।

এর মধ্যে আর একটি ব্যাপারও ঘটল। এক টিউশানির বাড়িতে ছেলেটি বরাবর অঙ্কে ফেল করেছে, চন্দন এক বছর পড়াবার পর সে মাধ্যমিকে অঙ্কে পেল সত্তর পার্সেন্ট। তার বাবা এতই খুশি হয়ে গেলেন যে চন্দনকে তিনি একটি দামি হাতঘড়ি উপহার দিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর এক বন্ধুর ওষুধ কোম্পানিতে চন্দনের জন্য একটা মাঝারি ধরনের চাকরিরও ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু একটাই শর্ত, উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত তাঁর ছেলেকে অঙ্ক শেখাতে হবে চন্দনকেই। সেই ওষুধ কোম্পানিতে অবশ্য ইন্টারভিউও দিতে হল।

চাকরির নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে চন্দন বাড়িতে এসে এ খবরটা দিতে তার বাবা-দাদারা দারুণ অবাক। ওঁরা তিনজনে এর আগে বহু পরিচিত ব্যক্তিকে চন্দনের চাকরির জন্য ধরাধরি করেছেন, কোনও লাভ হয়নি। এখন চন্দন নিজেই চাকরি জোগাড় করে নিয়ে এল এই বাজারে? অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

এটাই যেন চন্দনের জীবনে প্রথম একটা দারুণ কৃতিত্ব।

শুধু দিবাকরের মনে একটা ক্ষীণ আশঙ্কা থেকে গেল। চাকরি পাওয়ার চেয়েও চাকরি রক্ষা করা অনেক কঠিন কাজ। চন্দন তা পারবে তো?

তিন

পৃথিবীতে সব পুরুষের জন্যই একটি নির্দিষ্ট নারী থাকে, সব নারীর জন্য একজন পুরুষ। অনেক সময় তারা পরস্পরকে চিনতে পারে না, তাই অন্ধের মতন ঘুরে মরে।

চন্দনের জীবনে এখনও কোনও নারী নেই। শুধু রয়েছে এক জনের মুখের হাসি।

চন্দন সম্পূর্ণ একজন নারীকে খোঁজে না, শুধু সেই হাসিটা তার চোখে ভাসে, সেই হাসিটাকেই সে খোঁজে।

অন্য একটি নারী অবশ্য চন্দনকে চিনতে চেয়েছিল। কিন্তু শুধু দেখা হলে, এমনকী ঘনিষ্ঠতা হলেও চেনা হয় না, তার জন্য একটা বিশেষ সময়, বিশেষ জায়গা দরকার।

মেয়েটির নাম মুকুলিকা, সম্পর্কে সে চন্দনের পিসতুতো বোন। তার মা চন্দনের আপন পিসি নয়, বাবার মামাতো বোন, অর্থাৎ আত্মীয়তাটা বেশ দূরের, কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ অনেক দিনের। রামমোহন অন্যান্য সময়েও ব্যারাকপুরে মুকুলিকাদের বাড়ি যান, শুধু পুজোর সময় সপরিবারে আসেন বিজয়া করতে। বাবা-মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন বাড়িতে বিজয়ার প্রণাম করতে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের পক্ষে বাধ্যতামূলক, ছেলেরা অবশ্য একটু বড় হয়ে গেলেই এ ভাবে যেতে অস্বীকার করে। দিবাকর আর অশনি কৈশোরে পা দিয়েই স্বাধীন হয়ে গেছে, কিন্তু চন্দন, যেহেতু শান্ত ধরনের তাই বাবার নির্দেশ মেনে চলেছে অনেকদিন।

মুকুলিকারা দুই বোন, ওদের ভাই নেই, বড় বোন কাননিকা চন্দনের চেয়ে বড়। ওদের ডাক নাম মুকুল আর কানন। বিজয়ার প্রণাম করতে এসে তো শুধু মিষ্টি খেয়ে তক্ষুনি তক্ষুনি চলে যাওয়া হয় না, গল্প-গুজব ও আত্মীয় পরিজনদের খুঁটিনাটি খবর বিনিময় চলে অনেকক্ষণ ধরে। তখন চন্দনের নিজের দু'বোন আর এ বাড়ির দুটি মেয়ের মাঝখানে চন্দন একা কিশোর। সে বোকা বোকা মুখ করে, ঘাড় হেঁট করে বসে থাকে। সে এমনিতেই কথা বলে কম, অন্য বাড়িতে গিয়ে প্রায় বোবা।

একবার মুকুলিকার মা তাকে বলেছিলেন, তুমি চুপ করে বসে আছ, বই পড়বে? ডান দিকের কোণের ঘরে যাও, অনেক গল্পের বই আছে।

চন্দনের গল্পের বই পড়ার নেশা নেই, আবার একেবারে যে পড়ে না, তাও নয়। তবু একা একটি ঘরে বসার অধিকার পেয়ে সে অনেক স্বস্তি বোধ করে।

ঘরটিতে তিন দিকের দেওয়ালে র‍্যাক ভর্তি প্রচুর বাংলা-ইংরিজি বই। এর অধিকাংশই মুকুলিকার মায়ের সংগ্রহ। তিনি একজন লেখিকা। এই শান্তিপিসি নিছক গৃহবধূ নন, মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেন, একবার মেধা পাটেকরের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে যোগ দিতে গুজরাটেও গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামীও রেলে কাজ করেন, চন্দনের বাবার চেয়ে খানিকটা উঁচু পদে, তাই গুজরাট যাওয়া-আসার ভাড়া লাগেনি।

চন্দন এ ঘরটায় একটা বইতে মুখ আড়াল করে বসে থাকে, কিংবা জানলার কাছে গিয়ে একা একা দাঁড়ায়। জানলার বাইরে একটা ছোট তরকারির বাগান। কয়েক সারি ঢ্যাঁড়শ ও বেগুন গাছ, একটা মাচায় ঝুলছে কচি কচি ঝিঙে আর শশা। একটা মাত্র লঙ্কা গাছে প্রচুর লঙ্কা ফলেছে, সবই সবুজ, শুধু একটাই টুকটুকে লাল। দুটো ঝুঁটিওয়ালা মোরগ সেই বাগানে ঘোরাঘুরি করছে আর অনবরত ঠোক্কর মারছে শুধু ঢ্যাঁড়শ গাছে।

রেকাবিতে করে চন্দনের জন্য খাবার নিয়ে এসে এ ঘরে ঢুকে মুকুলিকা দেখল, সদ্য লম্বা হতে শুরু করা, হাফ প্যান্ট পরা কিশোরটি দাঁড়িয়ে আছে জানলার ধারে। পড়ন্ত বিকেলের লালচে রোদ পড়েছে তার মুখের এক পাশে, মুখের অন্য পাশটি স্নিগ্ধ শ্যামল, গাঢ় ভুরু, চোখ ভরা তন্ময়তা। মুকুলিকার অল্প ঢেউ খেলানো বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এই দৃশ্যটির মধ্যে যেন কিছু একটা আছে। সে ঘরে ঢোকার পরেও চন্দন তার দিকে মুখ ফেরায়নি, যেন সে একটা স্থির মূর্তি।

বয়েসে দু' বছরের ছোট হলেও মুকুলিকা চন্দনের তুলনায় এরই মধ্যে জীবন সম্পর্কে যাকে বলে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। নারী সুলভ অনুভূতি দিয়েই সে বুঝে গেল, এ ছেলেটিকে জয় করতে গেলে তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে, তাকেই আগে কথা বলতে হবে, কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ এর এখনও ঘুম ভাঙেনি, জাগাতে হবে তাকেই।

কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল, কিন্তু কিছু বলার আগেই সে জানলা দিয়ে দেখল মোরগ দুটিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন চলে গেল অন্যদিকে, সে বলে উঠল, দেখেছ, দেখেছ, শয়তান দুটো আবার এসেছে। সব নষ্ট করে দেবে।

হাতের রেকাবিটা নামিয়ে রেখে সে ছুটে বেরিয়ে গেল, বাগানে গিয়ে সে দৌড়ে দৌড়ে তাড়াতে লাগল মোরগ দুটিকে। পাশের বাড়ির মোরগ-মুর্গি যখন তখন ঢুকে পড়ে এই তরকারির বাগান নষ্ট করে দেয়, এদের তাড়াবার দায়িত্ব মুকুলিকার।

চন্দন কিন্তু মোরগ দুটোকে লক্ষই করেনি, এমনকি এখনও যে একটি গোলাপি রঙের ফ্রক পরা কিশোরী দৌড়ে দৌড়ে মোরগ তাড়া করছে, তাও যেন সে দেখেও দেখছে না। তার দৃষ্টি টেনে রেখেছে লঙ্কা গাছটি। চন্দন ঝাল খেতে পারে না, লঙ্কার প্রতি তার কোনও আসক্তি নেই, কিন্তু অতগুলি সবুজ লঙ্কার মধ্যে একটি মাত্র টকটকে লাল, এটাই যেন এক মহা বিস্ময়ের ব্যাপার।

সবুজ লঙ্কাগুলোকে শক্ত হলেই তুলে নেওয়া হয়, শুধু একটি-দুটিকে পাকতে দেওয়া হয় বীজ করার জন্য, এই জ্ঞান জানেনা সে ধার ধারে না। দৃশ্যটির অভিনবত্বই তার দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে রেখেছে। কিন্তু অভিনব হলেও এ দৃশ্য এতক্ষণ ধরে দেখবার কী আছে? এ প্রশ্নের উত্তর চন্দনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।

মায়ের মৃত্যুর পর সপরিবারে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিজয়া করতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

মা চলে গেলেন অকস্মাৎ, ভোর রাতে। আগে থেকেই তাঁর হৃদযন্ত্রে রোগ বাসা বেঁধেছিল কি না তা তিনি কারওকে জানতে দেননি, স্বামীকে তিনি ওষুধ খাওয়াতেন নিয়মিত। নিজে কখনও ডাক্তার দেখাতেন না, এমনকি সেই শেষ রাতেও যখন তিনি বিছানায় ছটফট করছেন, ভীত রামমোহন ছেলেদের জাগিয়ে তুলে বলছেন ডাক্তার ডাকতে। সেই তখনও মা বলেছেন, না, না, এখন ডাক্তার ডাকতে হবে না। সকাল হোক, জল খাচ্ছি তো, কমে যাবে। সেই সকাল আর তাঁর দেখা হল না। বাঙালি মায়েদের আত্মত্যাগের মহিমার নেশায় সুরমা অকালে চলে গেলেন।

মায়ের মৃত্যুই চন্দনের জীবনের প্রথম শোক। অসম্ভব তীব্র সেই শোক। এর আগে সে তার জ্যাঠামশাই ও দিদিমার মৃত্যুর সময় কাছাকাছি ছিল, কিন্তু তেমন কিছু বোধ করেনি। কিন্তু মা নেই, এ বাড়িটা মা-শূন্য, এটা সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, এমনকি তার মনে হতে লাগল, তার বাবা, দাদারা, বোনেরা, বউদিরা এরা কেউই তার নিজের নয়, একমাত্র মা-ই ছিল আপন মানুষ, এই সংসারের সঙ্গে যোগসূত্র। মায়ের যে সে প্রিয় সন্তান ছিল তাও নয়, কোনও মা সব সন্তানকে সমান চক্ষে দেখেন না, সুরমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল বড় ছেলে দিবাকর আর শেষ সন্তান বিন্নির প্রতি, চন্দনকে মনে করতেন অপদার্থ। স্নেহ যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছিল ক্ষোভ এবং দুশ্চিন্তা।

মা তাকে কতটা ভালোবাসেন না বাসেন, তা নিয়ে চন্দন কখনও চিন্তা করেনি। মা-ই যে তার একমাত্র সংসার-বন্ধন এটা সে অনুভব করল মায়ের মৃত্যুর পর। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর নাড়ি কাটা হলে শিশু যেমন কেঁদে ওঠে, তেমনই যেন দ্বিতীয়বার নাড়ি কাটা হল চন্দনের, সে কাঁদলও বেশ কয়েকদিন ধরে। মাতৃগর্ভের নিরাপত্তা ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে এসে শিশু অসহায় বোধ করে, চন্দনেরও সে রকম অনুভূতি হয়েছিল, কিন্তু সে তো শিশু নয়, সে নিজের পায়ে হাঁটতে পারে, ইচ্ছে মতন দিক বদলাতে পারে। বরং বলা যায়, মায়ের মৃত্যু তার চরিত্রে একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিল।

এবং বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও আলগা হয়ে গেল, বাবা-দাদারা উপদেশ, পরামর্শ, বকুনি যাই দিক, সে মন দিয়ে শোনে না, সে সব মানবে কি মানবে না, তা স্বাধীন সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

অশনি সস্ত্রীক কানপুরে চলে গেছে। বাড়িতে এখন দুটি রমণী, বড় বউদি শান্তা আর মুন্নি। বিয়ের আগে থেকেই শান্তা একটি অফিসে রিসেপশনিস্ট-এর চাকরি করে। এখনও সেটা ছাড়েনি। মুন্নিও একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কপি রাইটার। দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না। রামমোহনের একা একা লাগে। একা থাকলেই মৃত্যুভয় তাঁকে পেয়ে বসে। চন্দনও এখন অফিসে যায়, অবশ্য চন্দনের বাড়িতে থাকা-না-থাকা সমান।

মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, বাড়িতে শুধু একজন ঠিকে ঝি ছাড়া সর্বক্ষণের কাজের লোক ছিল না, রান্না-বান্না সব তিনিই করতেন। এখন রাঁধুনি রাখতে হয়েছে, রামমোহনের মতে তার রান্না মুখে তোলা যায় না। ডাল রাঁধে যেন ঘর মোছা ন্যাতা ধোওয়া জল, আর মাছের ঝোলে সাঁতার কাটা যায়, এমনকি বেগুন ভাজারও এক পিঠ বেশি কালো করে ফেলে। অর্থাৎ শান্তা ও মুন্নি দু জনেরই চাকরি করা তিনি পছন্দ করেন না। এখন মধ্যবিত্ত পরিবারের সব মেয়েই লেখা-পড়া শেখে, তারা শুধু রান্না করার জন্য বাড়িতে বসে থাকবে কেন? পুত্রবধূ বা মেয়ে রামমোহনের আপত্তি হেসে উড়িয়ে দেয়।

তাদের জব্দ করার জন্য রামমোহন ফন্দি আঁটেন।

রাঁধুনিটি সকালে আসে, এক সঙ্গে দু'বেলার রান্না করে দিয়ে দুপুরে চলে যায়। বিকেলের চা-টা রামমোহনকে পাড়ার দোকানে গিয়ে খেতে হয়। কারণ, তিনি কখনও চা তৈরি করা তো দূরের কথা, রান্নাঘরে ঢুকতেই চান না, গ্যাসের উনুন জ্বালতেও শেখেননি।

এক সন্ধেবেলা অন্যরা একে একে বাড়ি ফেরার পর রামমোহন ঘোষণা করলেন, আজ কিন্তু রাত্তিরের খাবার নেই।

শান্তা জিজ্ঞেস করল, বামুনদিদি ছুটি নিয়েছে বুঝি?

রামমোহন বললেন, ছুটি নেবে কেন? তাকে আমি কুত্তার মতন তাড়িয়ে দিয়েছি।

এর পর স্বাভাবিক ভাবেই শান্তার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কেন?

কিন্তু শান্তা তা জিজ্ঞেস করল না। অফিস থেকে ফিরেই সে অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট ধরে স্নান করে, সেটা তার কাছে এমনই প্রয়োজনীয় যে রাত্তিরে কী খাওয়া হবে না হবে, এরকম তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। সে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল।

রামমোহন ভেবে রেখেছিলেন, তিনি সবিস্তারে রাঁধুনি বিদায় পর্ব বর্ণনা করবেন। সেটা হল না বলে তাঁর রাগ বাড়তে লাগল। আজকাল এ সংসারের অনেক কিছুই তাঁর মতে চলে না। মেয়েদের চাকরি করা তিনি পছন্দ করেন না। বাইরের লোকের দায়সারা রান্না পছন্দ করেন না, এমনকি অশনি যে বউকে নিয়ে কানপুর চলে গেল, সেটাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি আর গৃহকর্তা থাকছেন না, আস্তে আস্তে তাঁর অধিকার চলে যাচ্ছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

রাগে গজরাতে গজরাতে তিনি দিবাকরদের ঘরের সামনে এসে চেঁচিয়ে বললেন, ওই রাঁধুনি মাগীটা চোর, এক নম্বরের চোর, তোমরা তো দুপুরে কেউ বাড়ি থাকো না, ও একদিন তেল সরায়, একদিন চিনি, মাসকাবারি বাজারে কুড়ি দিনও চলে না, আজ আমি একটু বলতে গেছি, আমার মুখে মুখে তর্ক করে, আর কী কুৎসিত ভাষা, মেরে ওর দাঁত ভেঙে দিতে হয়।

দিবাকর চুরুট মুখে বেরিয়ে এসে হালকা ভাবে বলল, কী সর্বনাশ, বাবা, সত্যি সত্যি মারনি তো?

রামমোহন বলল, মারলে আমার গায়ের ঝাল মিটতো।

দিবাকর বলল, না, না, দরকার হলে তুমি আমাদের মেরো, যেমন আগে মারতে। আজকাল মেয়েদের গায়ে হাত তুললে জেল হয়ে যায়। কাগজে পড়নি পাঞ্জাবের একজন পুলিশের বড় কর্তাকে পর্যন্ত... এই বামুনদিদিকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, আর একজন খুঁজে আনলেই হবে।

রামমোহন বললেন, সেও যে চোর হবে না, তার কোনও মানে আছে? রান্নাই বা কি ছিরি হবে।

দিবাকর বলল, ভালো করে যাচাই করে নেব। এবার মেয়ের বদলে একজন পুরুষ রাখলে কেমন হয়?

কেন, পুরুষরা বুঝি চুরি করে না?

তা নয়, চুরি তো মেয়ে বা পুরুষ সবাই করতে পারে, আবার নাও পারে। বলছিলাম এই জন্য যে পুরুষ হলে হয়তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবে না। এই বামুনদিদির সঙ্গে তো তোমার প্রায়ই

একটা খ্যাটাছেলে, যদি দুপুরবেলা আমার গলা টিপে মেরে রেখে যায়? আমি একা থাকি। কাগজেই তো বেরোয়।

ও রকম ভাবলে তো... আচ্ছা, অন্য একটা ব্যবস্থাও করা যায়

তোরা কেউ আমার কথা ভাবিস না।

মুন্নি এবার বেরিয়ে এসে বলল, বাবা, তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না। আজ রাত্তিরে আমি লুচি ভেজে দিচ্ছি। দরকার হলে আমি দু'একদিন ছুটি নেব। তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

দিবাকর বলল, তুই ছুটি নিবি কেন? সে তো শান্তাও ছুটি নিতে পারে। আজকাল অনেক ভাল ব্যবস্থা আছে। অনেকে রান্না করা খাবার দু'বেলা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। আমাদের সোদপুরেও এরকম আছে, স্টেশনের কাছে বিজ্ঞাপন দেখেছি, ওদের ফোনও আছে। এটাই সবচেয়ে ভালো হবে। বাড়িতে রান্না-বান্নার পাট রাখারই দরকার নেই। শুধু ছুটি-ছাটার দিনে নিজেরা...

এরকম একটা প্রস্তাব শুনে রামমোহন কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেলেন। এরা বলে কী? এ কি তাঁর ছেলে! বাঙালি? না অন্য গ্রহ থেকে এসেছে?

তিনি ঝিমঝিম করে বললেন, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হোটেলের রান্না খাব!

দিবাকর তাড়াতাড়ি বলল, হোটেল না বাবা, এক একটা ফ্যামিলি, একেবারে বাড়ির মতন রান্না করে, বেশি তেল-ঘি-মশলা দেয় না।

রামমোহন বললেন, বাড়ির রান্না না ছাই! যাদের খেতে না পেয়ে মা, তাদের জন্য রান্না করতে কারও মন থাকে? কচুর শাক, চুনো মাছের

This Book Downloaded From http://doridro.com

ঝাল, বেগুন ভাজা।

দিবাকর বলল, কচুর শাক-টাক দেয় কি না জানি না, তবে বেগুন ভাজা দেবে না কেন, পরে গরম করে নিতে হবে। কিংবা রাত্তিরে। খাওয়া দাওয়ার আইটেমের ব্যাপারে কিছুটা কমপ্রোমাইজ করতেই হবে। বাঙালিদের বড্ড বেশি রকম আইটেম লাগে, পাঞ্জাবিদের দেশে, শুধু রুটি আর আচার হলেই

মুন্নি বলল, আমাদের অফিসের অনেকেই এই রকম রোজ খাবার আনিয়ে খায়। রান্না-বান্নার ঝামেলাই নেই, এতে নাকি শস্তাও পড়ে।

রামমোহন কপালে চাপড় মেরে বললেন, হা কপাল! আমার এতগুলো রোজগেরে ছেলেমেয়ে, তারা আমাকে এখন শস্তার খাবার খাওয়াতে চায়। তা হলে আর তোদের এত লেখাপড়া শিখিয়ে আমার কী লাভ হলো?

দিবাকর হাসতে হাসতে বলল, বাবা, ছুটির দিন, শনিবার-রবিবার তোমাকে আমরা ভালো ভালো রান্না খাওয়াবো। তুমি যা চাও

রামমোহন আবার নিজের তেজ ফিরে পেয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, না, আমি কিছুতেই রোজ রোজ অন্য বাড়ির রান্না খাব না। ওরা কী তেলে রাঁধে, নিশ্চয়ই শস্তার...ডাক্তার আমাকে বাদাম তেল খেতে বলেছে! আমি বাজার করব এ বাড়িতে আমার ইচ্ছে মতন রান্না হবে। আবার একটা রাঁধুনি বামনির খোঁজ কর। চন্দন, চন্দন! এদিকে আয়।

মুন্নি জিজ্ঞেস করল, ছোড়দাকে ডাকছো কেন হঠাৎ?

রামমোহন বললেন, বাড়িতে কী হচ্ছে, সে ব্যাপারে ও ছেলেটার কোনও হুঁস আছে? সেও যে এ বাড়ির একটা প্রাণী, তা বোঝা যায়? শুধু দু'বেলা বসে বসে গিলবে, সে খাবার কোথা থেকে আসে, তারও খোঁজ রাখবে না?

দিবাকর বলল, বসে বসে খাবে কেন, চন্দন এখন চাকরি করছে, ওর মাইনের টাকার প্রায় সবটাই তো তোমার হাতে তুলে দেয়।

রামমোহন বললেন, শুধু টাকা দিলেই হলো, সংসারের কোনও দায়িত্ব নেবে না! আজ অবদি কুটোটা পর্যন্ত নাড়েনি। ওর আমি এমন বিয়ে দেব, যে বউ বাড়িতে থাকবে, চাকরি করবে না।

মুন্নি বলল, সর্বনাশ, তুমি বুঝি এক রাঁধুনির সঙ্গে ছোড়দার বিয়ে দিতে চাও?

রামমোহন বললেন, ওর নিজের বিয়ে করার মুরোদ নেই। বয়েস তো কম হলো না! কোন্ টরটরে মেয়ে ওকে বিয়ে করবে? আমাকেই এবার ব্যবস্থা করতে হবে।

চন্দন তার তিনতলার ঘরে বসে আছে। দোতলায় যে সব কথাবার্তা হচ্ছে, তার কিছু কিছু কানে গেলেও সে মন দেয়নি। অশনি একটা ক্যাসেট প্লেয়ার রেখে গেছে, এই সময় সে গান-বাজনা শোনে। গানের চেয়েও সে যন্ত্রসঙ্গীতই বেশি পছন্দ করে, সেতার, সরোদ, বাঁশি, বেছে বেছে সে এই সব ক্যাসেট কিনে আনে।

বাবার ডাক শুনে সে নিচে নেমে এলো।

রামমোহন তাকে বললেন, রাত্তিরে কী খাবার জুটবে তা জানিস? যা, স্টেশনের কাছে গিয়ে দ্যাখ একজন রাঁধুনি পাস কি না! হোটেলগুলোতে খোঁজ কর।

দিবাকর বলল, চন্দন এখন কী করে খোঁজ করবে! রান্নার লোক এত সহজে পাওয়া যায় নাকি? চেনাশুনো সবাইকে বলতে হবে, বিশ্বাসী লোক হওয়া দরকার। রাস্তা থেকে উটকো কাউকে ধরে আনা যায়?

রামমোহন তিতি বিরক্তভাবে বললেন, তবু ও কিছু একটা করুক। কোনও দায়িত্ব নেবে না, শুধু বসে বসে গিলবে, এ আমার সহ্য হয় না।

তিনি চন্দনকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, যাঃ, বাইরে যা। চেষ্টা কর অন্তত।

দিবাকর চন্দনের পাশে এসে বলল, বাবা, তুমি এটা অন্যায় করছ। সবাই সব কিছু পারে না। তোমাকে কয়েকটা দিন ক্যাটারারের খাবার খেতেই হবে, সাতদিনের মধ্যে আমি রাঁধুনি জোগাড় করে আনব, কথা দিচ্ছি। শান্তার মাকে বললে...

মুন্নি বলল, ছোড়দা, আমি লুচি ভাজব, তুই একটু সাহায্য করবি? তুই তো এক সময় ভাল লুচি বেলতে পারতি।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, সত্যি, ছোটবেলায় মা'র পাশে বসে ছোড়দা লুচি বেলতো, রুটি বানাতো। ছোড়দার লুচি-রুটিগুলো একেবারে ঠিকঠাক গোল গোল হয়।

দিবাকর বলল, চন্দন যা করে, খুব একমন দিয়েই তো করে। তা বলে আজ চন্দনের লুচি বেলতেও হবে না। শান্তা আছে কী করতে? বাড়ির বউ কিছু করবে না। দেওরকে দিয়ে লুচি বেলাবে, এটা হয় নাকি?

শান্তা এতক্ষণে স্নান সেরে, সেজেগুজে বাইরে এসে বলল, বাড়ির বউও আরও অনেক কিছু করবে। ফ্রিজে অনেকটা কিমা আছে, কাল মাশরুম এনেছি, কিমা-মাশরুম-আলু দিয়ে একটা নতুন ধরনের রান্না হবে। বাবাকে আজ আমরা লুচি, আলুভাজা আর কিমার তরকারি খাওয়াবো। বাবা, আপনার আর কিছু লাগবে?

রামমোহন গোমড়া মুখে বললেন, না, ওই যথেষ্ট।

শান্তা বলল, তবু আর একটা জিনিস লাগবে। লুচির সঙ্গে শেষ পাতে একটু মিষ্টি না হলে জমে না। আমরা ঘটিরা একটু মিষ্টি না খেয়ে পারি না। চন্দন, তুমি যাও, খানিকটা মিহিদানা কিংবা বোঁদে কিনে আন। ওগুলো না পেলে কাঁচাগোল্লা আনবে। বাবা, এইবার আপনি একটু হাসুন তো।

দিবাকর বলল, ভাল করে রান্না কর আগে, ঠিক মতন স্বাদ হোক, তখন তো বাবার মুখে হাসি ফুটবে।

এই ঘটনাটিকে মধুরেণ সমাপয়েৎ বলা যেতে পারত, কিন্তু এর মাঝখানে চন্দনকে হঠাৎ রামমোহনের গলা ধাক্কা দেওয়াটা ঠিক যেন খাপ খায় না। অথচ এরকম প্রায়ই হয়। রামমোহন যখনই বড় দুই ছেলের কাছে, তাদের বউদের, এমনকি মুন্নির কাছেও যুক্তিতে হেরে যান, তখন তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ে চন্দনের ওপর। চন্দনের কোনও যুক্তি নেই, কোনও প্রতিবাদ নেই। তাই রামমোহনের সব কোপ পড়ে চন্দনের ওপর।

দাদা-বউদিরা, আর ছোটবোনও যে চন্দনকে সব সময় আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে, তাতে কিন্তু চন্দনের ভ্রূক্ষেপ নেই। এক হিসেবে তাকে অকৃতজ্ঞও বলা যেতে পারে।

দেওর-বউদির সঙ্গে যে-মধুর স্নেহের সম্পর্ক হয়, চন্দনের সঙ্গে শান্তার তা হয়নি। শান্তা বেশ সুশ্রী এবং সব সময় সপ্রতিভ, তবু চন্দন তার কাছে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়, শান্তা কিছু বললে বা প্রশ্ন করলে চন্দন উত্তর দেয়, কিন্তু সে নিজে থেকে একটা কথাও বলে না। চন্দনের এরকম ব্যবহার বাড়ির অন্যান্যদের মতন শান্তাও মেনে নিয়েছে। বাপের বাড়ির লোকদের প্রতিই শান্তার বেশি টান, তারা প্রায়ই কেউ না কেউ আসে, দুই বউদিরই একই বাপের বাড়ি, তাই এখন এ বাড়িতে তাদেরই প্রাধান্য। শান্তা অবশ্য চন্দনকে তাচ্ছিল্য করে না কখনও।

ছোট দুই বোনের সঙ্গে অল্প বয়েসে চন্দনের ভাব ছিল, এক সঙ্গে পুতুল নিয়েও খেলেছে, কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কত কিছুর তফাত হয়ে যায়। বিন্নি এখানে থাকে না। মুন্নির ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ পায় সেই যেন চন্দনের চেয়ে বড়। বোকা-সোকা ভাল মানুষ ছোড়দাটাকে তাকেই সামলে সুমলে রাখতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে যদি চন্দনের হঠাৎ এক পাটি চটি খুলে যায়, অমনি মুন্নি বলে ওঠে, এই ছোড়দা, কী করছিস, সাবধান, সাবধান! যেন পৃথিবীতে আর কারওর কখনও পা থেকে চটি খুলে যায় না। চন্দন একটা কাঁচের গেলাশ ভাঙলে মুন্নি দৌড়ে এসে বলে, ওমা, ছোড়দা, কী করলি? গেলাসটা ঠিক মতন ধরতে পারিসনি? এত অমনোযোগী হলে...। যেন পৃথিবীতে আর কারওর হাত থেকে কখনও গেলাশ পড়ে যায় না, কাঁচের গেলাশগুলির অজর, অক্ষয় হয়ে থাকার কথা।

এ সবের ফলে, বাড়ির দুটি রমণীর সঙ্গে চন্দনের মনের যোগ নেই। সে প্রায় নারীসঙ্গ বঞ্চিত।

চার

মুকুলিকার সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে দেখা হয় চন্দনের। জানলার পাশে দাঁড়ান, মুখের একপাশে রোদ লাগা কিশোরটিকে মুকুলিকা ভুলতে পারেনি।

এখন আর দুই পরিবারে যাতায়াত নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা হয় ট্রেনে, চন্দন অফিসে যায়, মুকুলিকাও পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মুকুলিকা সব সময় চেষ্টা করে যাওয়ার সময় ট্রেনের ডান দিকে জানলার পাশে বসতে। ব্যারাকপুর লোকাল পেয়েও যায়। সোদপুরে ট্রেন দাঁড়ালে সে প্ল্যাটফর্মে মানুষের ভিড়ে একজনকেই খোঁজে। চন্দনকে দেখতে পেলেই সে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ততক্ষণে কামরা ভিড়ে ভরে যায়, পাশে এসে বসা তো দূরের কথা, চন্দন কাছাকাছিও আসতে পারে না। তবে চোখাচোখি হয়। মেয়েদের চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই, আর চন্দনও ঠেলাঠেলি করবে না, তাই কথা হয় না।

চন্দন যে সব সময় গোমড়া মুখে থাকে তাও নয়, তার মুখখানা পরিষ্কার, হাসির বিনিময়ে সে হাসি দিতেও পারে। প্রতিদিনই সে একটা না একটা কিছু আকর্ষণীয় ব্যাপার দেখে, তবে সেই একটা কিছুতে আকৃষ্ট হলে সে আর অন্য কিছুতে তখন মন দিতে পারে না, সেটাই তার দুর্বলতা। একজন ভদ্রলোকের চুলের রং গোলাপি, মুখ দেখলেই বোঝা যায় তিনি কোনও দূর রাজ্যের মানুষ। মানুষের চুলের রং কালো কিংবা সাদা কিংবা নুন-গোলমরিচের মতন মেশামেশি, তবে চুলে গোলাপি রং লাগানোও অভাবনীয় কিছু নয়, অন্য লোকরা বড় জোর দু'এক পলক তাকিয়ে দেখে, কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যে শুধু এক জনের মাথায় ওরকম রং দেখলে চন্দন এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে সারা পথটা ওই চিন্তাতেই কেটে যায়, সে ভুলে যায় মুকুলিকার অস্তিত্ব।

সেই জন্যই শিয়ালদা স্টেশনে নেমে মুকুলিকার জন্য অপেক্ষা করার কথা তার মনে থাকে না। সে এগিয়ে যায় গেটের দিকে। মুকুলিকা প্রায় ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে। সামান্য টুকিটাকি কথা হয়। যেমন, আজ ট্রেনচোদ্দো মিনিট লেট, কী গরম পড়েছে, পরশু কি বন্ধ হবে, দমদম জংশনে আজ কী নিয়ে মারপিট হল?

বাইরে এসে চন্দন হাওড়ার বাস ধরে। তার অফিস হাওয়া ময়দানের পাশে।

ফেরার সময় দু'জনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মুকুলিকা অফিস ছুটির ভিড় শুরু হবার আগেই ট্রেন ধরে, চন্দনের ফিরতে দেরি হয়।

কমলিকা প্রত্যেকদিন এক কামরায় ওঠে, সেটা থামে সোদপুরের প্ল্যাটফর্মের একটু সামনের দিকে। চন্দন কিন্তু প্রতিদিন সেখানে দাঁড়ায় না। মুকুলিকা তার জন্য যতটা ব্যগ্র হয়ে থাকে, চন্দন ততটা আগ্রহ বোধ করে না। মুকুলিকাকে দেখতে না পেলে তার কথা চন্দনের মনে পড়ে না। মুকুলিকাকে সে এড়িয়ে যেতেও চায় না, তা হলে তো মুকুলিকার কথা তাকে চিন্তা করতে হবে। এক একদিন মুকুলিকার হাতছানিও সে দেখতে পায় না, তখন তার নজর অন্যদিকে।

অ্যারিস্টটল বলেছেন, মানুষের চোখ যদি জন্তু হয়, তবে দৃষ্টি তার আত্মা। চন্দন তার আত্মার সবটুকু শুধু একটা ছোট দৃশ্যের দিকে নিবদ্ধ রাখে, তাই অন্য কিছু দেখে না।

একদিন চন্দনকে স্পষ্ট দেখতে পেল মুকুলিকা, সে প্ল্যাটফর্মে বেশ কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা যুবা, চন্দন সাদা ছাড়া অন্য পোশাক পরে না, মাথার চুল পরিপাটি আঁচড়ানো, পালিশ করা জুতো, শান্ত মুখ। মুকুলিকা হাতছানি দিচ্ছে, চন্দন দেখতে পাচ্ছে না, এমন সময় হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে সঙ্গে পায়রার ঝাঁকের মতন মানুষরা ঝটাপট করে যে-যে কামরায় পারল উঠে পড়ল, অনেকে ছুটে গেল প্ল্যাটফর্মের ছাউনির নিচে। শুধু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল চন্দন, তার আশপাশ ফাঁকা হয়ে গেছে। হুইসল দিয়ে গা মুচড়ে ট্রেনটা চলতে শুরু করে দিল, চন্দন সে ট্রেনে উঠলোই না।

চন্দনের বৃষ্টি ভেজার নেশার কথা মুকুলিকা আগেই জেনেছে। কিন্তু যে অফিস যাবার সময়ও ইচ্ছে করে বৃষ্টি ভেজে, সে কেমন ধরনের মানুষ? আজ কি চন্দন অফিস যাবে না? অথচ যেসব দিনে একসঙ্গে যায়, শিয়ালদায় নেমে চন্দন তো কখনও বলে না, আজ আর অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না, চলো না আজ আমরা একটা সিনেমা দেখতে যাই। কিংবা ভিক্টোরিয়ার বাগানে বসে দুপুরটা কাটাই।

মুকুলিকা তো ইচ্ছে করলেই এক আধদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস বন্ধ দিতেই পারে। কিন্তু চন্দনের যেন অফিসের প্রতি খুব টান, একটুও দেরি করে না। চন্দনের এই উদাসীনতা কিংবা অনাগ্রহই মুকুলিকাকে বেশি কৌতূহলী করে তোলে।

মুকুলিকা তার বালিকা বয়েস পেরিয়ে এসে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে

ওঠেনি বটে কিন্তু শরীর গঠনে ও ব্যক্তিত্বে সে বেশ আকর্ষণীয়া।

বাচ্চা বয়েসে মুকুলিকাকে ছেলেদের পোশাকে সাজিয়ে রাখা হতো। কারণ তাদের ভাই হয়নি। প্রায় দশ বছর বয়েস পর্যন্ত ফ্রকের বদলে সে প্যান্ট শার্ট পরেছে। পুতুল খেলার বদলে সে কোমরে ঝুলিয়ে রাখত খেলনা পিস্তল। আর একটু বড় বয়েসেও ইস্কুলের থিয়েটারে সবসময় তার পুরুষের পার্ট, সেই জন্য তার একটা দুই বুকপকেটওয়ালা জামা তৈরি করা হয়েছিল।

মুকুলিকার মনের মধ্যে কিন্তু পুরুষ ভাব দানা বাঁধেনি। কৈশোরে পৌঁছোবার পর তার শরীরেও নারীত্ব বেশি বেশি ফুটে উঠতে শুরু করে। পুরুষদের সম্পর্কে কৌতূহল ও আকর্ষণ তীব্র হয়ে ওঠে। একটা বয়েস পর্যন্ত সব ছেলে-মেয়ের মনেই নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক বিষয়ে অনেকটা অস্পষ্টতা থাকে, যেন অমীমাংসিত রহস্য। যতই বড়দের সিনেমায় কিংবা রগরগে খারাপ বইতে ওই সব বর্ণনা থাকুক, তবু রহস্যটা কাটে না। পনেরো বছর বয়েসে জেঠতুতো দাদা পলাশ যখন একদিন নির্জন বাড়িতে তাকে জোরে চেপে ধরে, যাকে বলে অসভ্যতা, তাই করতে চেয়েছিল, মুকুলিকা বিশেষ বাধা দেয়নি, কারণ ব্যাপারটা সত্যিই কী তা সে জানতে চেয়েছিল। সেই দিনই সে বুঝে ছিল, এটা একদিনে জানা যায় না, সারাজীবন ধরে জানতে হবে।

ষোলো বছরের জন্মদিনে মা তাকে কয়েকটি বই উপহার দিয়েছিলেন। প্রত্যেকবারই মা বই দেন, আগে বাংলা বই দিতেন, এবারে ইংরিজি বই। মাধ্যমিকে মুকুলিকা ভাল নম্বর পেয়েছিল ইংরিজিতে, মা বলেছিলেন, সব বুঝিস না বুঝিস, একটু একটু করে পড়বি, আস্তে আস্তে বুঝবি।

জন্মদিনে কয়েকজন স্কুলের বন্ধুকেই শুধু ডাকা হয়, খাওয়া-দাওয়া চুকে যায় রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে, কারণ অন্য মেয়েদের বাড়ি ফিরতে হবে। এগারোটার মধ্যে এ বাড়ি নিঝুম, সবাই শুয়ে পড়ে, শুধু শান্তি ছাড়া। তিনি এই সময় লেখেন। তিনি একটা বড় উপন্যাসের প্রায় শেষের দিকে এসে গেছেন, তাই সব সময় অন্যমনস্ক থাকেন, কোনদিন কী রান্না হবে তা নিয়ে মাথা ঘামান না, এক একদিন লিখতে লিখতে রাত ভোর হয়ে যায়।

সে রাতে প্রায় দেড়টার সময় শান্তি পা টিপে টিপে এসে ঘুমন্ত ছোটমেয়েকে জাগিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, মুকুল, একবার আমার ঘরে আয় তো লক্ষ্মীটি!

যখন লেখার ঘোরে থাকেন, তখন শান্তিকে আর মা কিংবা এই সংসারের গৃহিণী মনে হয় না, যেন অন্য মানুষ। তাঁর চোখে খুব বেশি মাইনাস পাওয়ার, তাই অন্য সময় চশমা পরে থাকেন। বই পড়া বা লেখার সময় চশমা লাগে না। মাথার চুল আঁচড়াননি, ব্লাউজের একটি দিক কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। বয়েস এখনও পঞ্চাশ হয়নি, তবু শান্তিকে তার চেয়েও বেশি বয়স্কা দেখায়।

নিজে চেয়ারে বসে মুকুলিকাকে বললেন, তুই দেওয়ালের কাছে দাঁড়া।

মুকুলিকা দাঁড়িয়ে রইল, শান্তি তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষে, কোনও কথা বললেন না।

মুকুলিকার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। মাঝরাতে মা ডেকে আনলেন, সে কি কোনও অন্যায় করেছে? আজ অন্যদের সঙ্গে পলাশও এসেছিল, সে তার বোনকে জন্মদিনের আশীর্বাদ জানাবার জন্য জড়িয়ে ধরেছিল বেশ ঘনিষ্ঠভাবে, বুকে বুক ঠেকিয়ে। কিন্তু সে তো পলাশকে আর পাত্তা দেয় না। একবার তার ওই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, আর সে পলাশের সঙ্গে অসভ্যতা করতে চায় না।

একসময় সে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মা?

শান্তি থেমে থেমে বললেন, তোর আজ ষোলো বছর পূর্ণ হল, আমি যে উপন্যাসটা লিখছি, সেটা অনেকটাই আমার নিজের জীবন নিয়ে, শেষ হলে পড়ে দেখিস। তোর মতন বয়েসে আমার চেহারা কীরকম ছিল, মনেই পড়ছে না।

কেন, তোমার ছবি নেই ও বয়েসের?

ভাগলপুরে ছিলাম। কে আর ওখানে ছবি তুলবে? কম বয়েসের একটা গ্রুপ ফটো আছে, তাতে আমার শুধু মুখটা চেনা যায়।

তোমার বিয়ের ছবির তো একটা অ্যালবাম আছে। আমি দেখেছি।

আমার বিয়ে হয়েছে একুশ বছর, না, বাইশ বছর বয়েসে। ষোলো বছরে আর বাইশ বছরে বউ চেহারা এক থাকে? তোর আঁচলটা সরা তো—

মায়ের সামনে লজ্জা পাবার প্রশ্ন নেই। কয়েক বছর আগেও তো মা তার সব জামা কাপড় খুলিয়ে স্নান করিয়ে দিতেন। সে তার আঁচলটা বুক থেকে ফেলে দিল।

শান্তি জিজ্ঞেস করলেন, ব্রা পরে আছিস?

বাঃ, ব্রা পরব না?

আমার মা শুতে যাওয়ার সময় ব্রা পরে থাকতে বারণ করতেন, কেন বারণ করতেন, তা জানি না। কাননের চেয়ে তোর সঙ্গেই বোধহয় আমার মিল বেশি ছিল, আমার বুক দুটোও অন্য মেয়েদের চেয়ে বড় ছিল। অন্য মেয়েরা খারাপ কথা বলতো, আমাদের বাড়িতে একজন মাস্টার থাকতো, তাকে বলতাম মাস্টারকাকা, লোকটা ভাল ছিল না, সে যখন তখন ছলছুতো করে... সব মেয়েদেরই, সেই বাচ্চা বয়েস থেকে শুরু, বাড়ির কাজের লোক, মামা-কাকা, দাদার বন্ধু, কেউ না কেউ গায়ে হাত, হরিণের মতন, মেয়েদের শত্রু তাদের শরীর, অথচ পুরুষদেরও শরীর আছে, মেয়েরা তো কখনও... হ্যাঁরে খুকি, তোর এরকম হয় না?

মুকুলিকা বলল, না, মা। আমি কারওকে কাছে ঘেঁষতে দিই না, আমার বিচ্ছিরি লাগে... কেউ যদি জোর করতে আসে, তা হলে আর কিছু না পারি, তার কান কামড়ে দেব!

পলাশের সঙ্গে এক দুপুরের ঘটনাটা সে গোপন করে গেল। কারণ সে তো স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিল, পলাশ জোর করতে পারেনি। এরপর পলাশ আবার চেষ্টা করলে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

শান্তি হেসে ফেলে বললেন, কান কামড়ে দিবি? এটা মন্দ না। আমার লেখার মধ্যে এটা দিতে হবে। তোর খুব ঘুম পেয়েছে? আমার ক'টা কথা শুনবি?

না ঘুম পায়নি। বল না।

তুই কি বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?

ধ্যাৎ! এখনই ওসব কী?

এখন না। তোর দিদির তো বিয়ে ঠিকই হয়ে গেছে, সামনের বছরই, তারপর তোর পালা, ছেলেরা পেছনে ঘুর ঘুর করবে। মেয়েরা বিয়ে করতে চায়, বিয়ের দিনটাতে কত গয়না, কত নতুন নতুন শাড়ি, সেই সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশান, ভবিষ্যৎটা তখন চোখে ভাসে না।

মা, আমি ওসব কথা একদমই ভাবি না।

আর ক'বছর পরেই ভাববি। তোকে একটা সত্যি কথা বলব খুকি? আমি কিন্তু বিয়ে করতে চাইনি। মোটেও বিয়ে করব না ঠিক করেছিলাম।

তোমাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে?

তা একরকম তাই। ভাগলপুরের দামড়া দামড়া ছেলেরা খুব বাঙালি মেয়েদের পেছনে লাগে। জোর করে গাড়িতেও তুলে নিয়ে যায়। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, তারপর মেয়েটাকে মেরেই ফেলল। তাই বাবা মা ভয় পেয়ে ঠিক করলেন, মেয়েকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে প্রথম যে পাত্র পেলেন, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে।

তুমি বিয়ে না করে এমনিই ভাগলপুর থেকে চলে এলে না কেন?

কোথায় যাব রে? এদিকে কেউ চেনা ছিল না।

বাবাকে তোমার পছন্দ হয়নি?

সে কথা তো বলিনি, বলেছি? আসলে বিয়ে ব্যাপারটাই আমার পছন্দ ছিল না। তোর বাবার কথা যদি বলিস, আমি তো আর দুটো বিয়ে করিনি, অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করব কী করে? অন্য কেউ বদ্ধ মাতাল, কিংবা দুশ্চরিত্র কিংবা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার হতে পারতো, তোর বাবার তো সে সব দোষ নেই। তার একটাই দোষ, বলব, কিছু মনে করবি না? বড্ড অর্ডিনারি! নেটিপেটি ধরনের। মাঝে মাঝে সেটাই আমার অসহ্য লাগে। যদিও সবাই বলে, অর্ডিনারি স্বামীরাই বেশি নির্ভরযোগ্য হয়।

বাবা তোমার লেখা বোঝে না? বইটাই পড়ে না।

বই না পড়ুক, আমার লেখা নিয়ে আদিখ্যেতা করারও দরকার নেই। কিন্তু একটা কিছু বৈশিষ্ট্য তো থাকবে! কোনও একটা দিকে ঝোঁক— তা নয় শুধু চাকরি আর বাজার করা, নর্দমা নিয়ে পাশের বাড়ির মিত্তিরদের সঙ্গে ঝগড়া, সেদিন কলের মিস্তিরিটাকে কীরকম বকাবকি করল, বেচারার কিছু দোষ ছিল না।

বাবা তোমার লেখা না পড়লেও তা নিয়ে কিন্তু গর্ব আছে। একদিন বিজনকাকুকে বলছিলেন, আমি শুনেছি।

কী নিয়ে গর্ব বল তো? আমার বই বিক্রি হয়, সে জন্য টাকা পাই। তবে, একথা ঠিক, তোর বাবা আমার কাজে কখনও বাধা দেয়নি, আমি যে সভা-সমিতিতে যাই, কোনওদিন সে জন্য... এই রে, ছি ছি ছি, আমার আর কোনওদিন বুদ্ধি হবে না, আমি যে বিয়ে করতে চাইনি, সেটা নিজের মেয়ের কাছে কেউ বলে? ছি ছি ছি—তুই নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছিস?

মায়ের মুখের অসহায় ভাব দেখে হেসে ফেলল মুকুলিকা। মা যেন এক এক সময় খুব ছেলেমানুষ হয়ে যায়।

হাসতে হাসতে সে বলল, কেন, দুঃখ পাবো কেন?

শান্তি কাঁচুমাচুভাবে বললেন, আমি বিয়ে না করলে তোরা কোথায় থাকতি? তোদের তো জন্মই হতো না!

মুকুলিকা কৌতুকের সুরেই বলল, তাই তো, আমরা কোথায় থাকতাম?

বিয়ের আগে, আমি মুখ ফুটে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারতাম না। মনে মনে ভাবতাম অনেক কিছু। বিয়ের কয়েক বছর পর আমার মনে অনেকটা জোর এলো। তখনও ঠিক করেছিলাম, তোর বাবাকে ছেড়ে আমি চলে যাব।। ছেলেরা লেখালেখির জন্য কত রকম ঝুঁকি নেয়, মেয়েরা সে রকম পারবে না কেন?

ছেড়ে গেলে না কেন?

সেই বছরই বড় খুকি পেটে এলো। ছেলেদের তো এ সমস্যা নেই, কিন্তু মেয়েরা কি পোয়াতি অবস্থায় সংসার ছাড়তে পারে? তারপর তুই এলি—

আমরা দু'জনেই তোমার বন্ধন?

তোরা দুটিতে আমার দু' চোখের মণি। তোদের ছেড়ে যাওয়ার কথা আর আমি কল্পনাও করিনি। বন্ধনও ভাবিনি রে! বরং তোরাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি একে একে। আর আমার জীবন তো ফুরিয়েই এল। তুই একটা কথা বল তো খুকি, তোর মতামত চাইছি, এই যে লেখাটা শেষ করছি, এটা পড়লেই সবাই বুঝতে পারবি, এটা অনেকটা আমারই জীবনের কথা। এতে যদি লিখি যে আমি বিয়ে করতে চাইনি, বিয়ে ব্যাপারটাই আমার পছন্দ ছিল না, সেটা কি খুব দোষের হবে?

দোষের কি আছে? যা সত্যি তাই লিখবে।

সব সত্যি কথা কি লেখা যায়। তোর বাবা যদি পড়ে, উনি পড়বেন না, কিন্তু কেউ না কেউ বলে দেবে।

তাতে কী আসে যায়, মা? তুমি তো শুধু তোমার ইচ্ছেটার কথা লিখবে। সত্যি সত্যি তো সেরকম ঘটেনি! মানুষ তো মনে মনে কত কিছুই ভাবে, আত্মহত্যার কথা ভাবে, কোনও লোকের ওপর রাগ হলে মনে হয়, ও লোকটা মরে না কেন, কেউ মনে মনে একজন ফিল্ম স্টারকে বিয়ে করতে চায়, এ সবের কোনও সিরিয়াসনেস নেই।

তুই তো বেশ ভাল ভাল কথা বলতে শিখেছিস। ইস, তোকে আমার হিংসে হচ্ছে। তোর বয়েসটা যদি আমি ফিরে পেতাম।

ফিরে পেলে কী করতে?

স্বাধীনভাবে জীবনটা শুরু করতাম। কিছুতেই বিয়ে করতাম না। বিয়ে জিনিসটা পৃথিবীতে থাকবেই। তবু, আমার মনে হয়, কোনও কোনও মেয়ের বিয়ে না করা উচিত। তারা মেয়েদের অধিকারের কথা ভালভাবে তুলে ধরতে পারে। বিয়ে করলেই অসুবিধে হয় অনেক। এই যে আমি লেখালেখি করি, এর মধ্যে খানিকটা হিপোক্রেসির ভাব আছে, আমি নিজেই তো বুঝি। ভেবে দেখ, তুই পারবি কি না। একটু এদিকে আয় তো, আমার ঘাড়টা টিপে দে। লিখতে লিখতে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।

জন্মদিনে শান্তি যে-বইগুলি উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলির নাম সিমোন দ্য বোভোয়ার'-এর দা সেকেন্ড সেক্স, জারমেন গ্রিয়ার-এর দা ফিমেল ইউনাথ; রিফ ট্যানহিল-এর দা সেক্স ইন হিস্ট্রি। একটা বাংলা বইও আছে, হুমায়ুন আজাদ-এর নারী। বাংলা বইটা আগে শেষ করে মুকুলিকা অন্য বইগুলোও পড়তে লাগল আস্তে আস্তে। কলেজ ছাড়িয়ে ইউনিভার্সিটিতে এসে সে বিয়ের কথা মুছে ফেলল মন থেকে। সে কিছুতেই বিয়ে করবে না, বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতেও তার ইচ্ছে করে না।

কিন্তু একটা অসুবিধে রয়েই গেল। মনের মধ্যে সব সময় একটা অশান্তি কিংবা জ্বালা। তার যে পুরুষদের ভাল লাগে! পুরুষদের কাঁধ, চোয়ালের গড়ন, চোখ, দাঁড়াবার ভঙ্গি। ছেলেদের কাঁধ সম্পর্কে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। যে-সব পুরুষদের তার বিশেষ ভাল লাগে, মনে মনে তার ইচ্ছে হয়, সেই পুরুষের জামাটা খুলে কাঁধদুটো একবার দেখার। মেয়েদের বুক সম্পর্কে বোধহয় ছেলেদেরও ওরকম ইচ্ছে হয়। ব্যায়ামবীরদের মতন চওড়া কাঁধ হবার দরকার নেই, কোনও কোনও পুরুষের কাঁধের একটা বিশেষ ঢৌল আছে, সেটাই সৌন্দর্য। মেয়েরা অনেক সময় হাত কাটা ব্লাউজ পরে, তাদের কাঁধ দেখা যায়, কিন্তু মেয়েদের কাঁধে বিশেষত্ব তো কিছু নেই। পুরুষদেরই ও রকম ব্লাউজ পরা উচিত। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা পুরুষদেরই ঠিক পুরুষের মতন দেখায়।

পাঁচ

ট্রেন অবরোধ এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। তবে সাধারণত এসব সকালের দিকে হয়, সাধারণ বাঙালিদের উত্তেজনা, ক্ষোভ, রাগ এসব বিকেলের পরে ঝিমিয়ে আসে, তখন ঘরে ফেরার তাড়া থাকে।

আজ যে সন্ধেবেলা হঠাৎ দমদম জংশানে বিরাট গণ্ডগোল, রেল লাইনের ওপর মানুষের ঢল ও পাথর ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেল, সেটা খানিকটা অভিনব তো বটেই, কারণটাও গুরুতর। প্রথম কারণটা ঠিক বোঝা যায়নি, কেন যে একদল যাত্রী ট্রেন থামিয়ে চেঁচামেচি করছিল, তার তিনরকম কাহিনী ছড়িয়েছিল, তারপর পুলিশ এসে হঠাৎ এলোপাথাড়ি লাঠি চালাতে শুরু করল, তাতে বেশ বড় ধরনের একজন স্থানীয় নেতার, যার নাম মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, তার মাথা ফেটে গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগল, একজন মহিলাও বিবস্ত্রা হলেন।

আমাদের পুলিশরা এক প্রকারের রহস্যময় প্রাণী। ঠিক কখন যে তাদের কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেবে, তা বোঝা শিবের বাবারও অসাধ্য। অনেক সময়ই তাদের অলস ও নিরীহ মনে হয়। ডাকাতির পর আর্ত মানুষের ডাকাডাকিতেও তারা আসতে চায় না, তখন বোধহয় তাদের ঘুমের সময়, পুলিশদেরও তো ঘুম দরকার। কখনও বিক্ষোভ মিছিলে তাদের দূরে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, হয়তো তখন তারা দার্শনিক চিন্তা করে। আবার হঠাৎ কোনও সময়ে তাদের যেন মনে পড়ে যায়, লাঠি, বন্দুক, টিয়ার গ্যাসের ক্যানেস্তারা এসবগুলো আছে কী করতে, মাঝে মাঝে ব্যবহার না করলে জং ধরবে! তাই যেন নিতান্ত কোনও তুচ্ছ কারণে তারা লাঠিয়াল ও বন্দুকবাজ হয়ে ওঠে। পুলিশরা মিছিল, শোভাযাত্রায় অভ্যস্ত, কিন্তু সে সবের মধ্যে মেয়েদের উপস্থিতি তাদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। পুলিশ মাত্রই কি মেল শভিনিস্ট? ইদানীং মেয়েদের বস্ত্র হরণের দিকে তাদের ঝোঁক বেড়েছে।

কোনও নেতার মাথায় লাঠি মারা পুলিশদের চাকরির শর্তে নেই। তবু আচমকা দু'একবার ভুল হয়ে যায়। বিশেষত সেই নেতার মাথায় যদি টাক থাকে। টাক মাথা দেখলে লাঠিয়াল পুলিশরা বেশি লোলুপ হয়ে পড়ে।

জল যেমন জল চায়, রক্তও তেমনই রক্ত চায়। নেতার মাথার রক্ত দর্শনে জনতা, যাদের অনেকেই ওই নেতার দলভুক্ত নয়, তারাও পুলিশের রক্ত দেখার জন্য উন্মত্ত হয়ে পড়ে। বন্দুকধারী পুলিশের দিকেও পাথর ছুঁড়তে দ্বিধা করে না। তার ফলে দু'দিকেই আরও রক্ত ঝরে।

প্রাচ্য দেশীয় মানুষরা সাধারণত একা একা ভীরু প্রকৃতির, কিন্তু দলে পড়লে বেপরোয়া। এমনিতে যে-ব্যক্তি আরশোলা বা মাকড়সা দেখে ভয় পায়, ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে মিশে থেকে সে অনায়াসে খুনী হয়ে উঠতে পারে। আজ অবস্থা বেশ ঘোরতর, এর মধ্যেই কয়েকজন পুলিশ আহত, স্টেশনের সব ঘরের কাচ ভাঙা হয়ে গেছে, কয়েকটা টাইম টেবিল উধাও, জনতা কিছুতেই পিছু হটছে না। আরও পুলিশ আসবে, কয়েকজন নেতাকেও আসতে হবে।

মোট কথা এখন এ লাইনে ট্রেন চলাচল সুদূর পরাহত।।

এ রকম অবস্থায় থেমে থাকা ট্রেন থেকে সব যাত্রী নেমে আসে, সকলেই যে পাথর ছোঁড়ে কিংবা স্টেশন মাস্টারের ঘর ভাঙচুর করে তা নয়, একদল নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজার সাপোর্ট দেয়।

মুকুলিকাও নেমে পড়েছে, অনেকটা এগিয়ে সে অকুস্থল দেখতে গিয়েছিল, জ্যান্ত পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটেও যেতে হয়েছিল প্লাটফর্মের অন্যদিকে। ঘটনার বিবরণ ও গুজব শুনে তারও বেশ রক্ত গরম। এই সময় পুলিশ মাত্রই যেন বিদেশি শত্রুর মতন, তারাও যে সাধারণ মানুষের মতন বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করে, তা কেউ ভাবে না। মুকুলিকা নিজের হাতে পাথর না ছুঁড়লেও পুলিশ মার খাচ্ছে, আহত হচ্ছে, এই দৃশ্য তার দেখতে ভাল লাগে।

অকস্মাৎ তার চোখে পড়ল, ব্যারাকপুর লোকালের একটি কামরা একেবারে ফাঁকা, শুধু জানলার ধারে মুখ নিচু করে একজন মানুষ বসে আছে। আর কে, চন্দন!

বাইরে কী সব তাণ্ডব ঘটছে, তাতে চন্দনের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, সে কামরার মেঝেতে কী দেখছে কে জানে!

ঠিক এই সময়ে, কার বুদ্ধিতে কে জানে, স্টেশনের সব আলো নিভে গেল। এবার জায়গাটা নরকুণ্ড হয়ে উঠবে। শোনা গেল, পর পর দুটি বোমার শব্দ। ট্রেনের যাত্রীরা কি পকেটে বোমা নিয়ে অফিসে যায়?

আর একটু দেরি হলেই অন্ধকারের মধ্যে চন্দনকে দেখতে পেত না মুকুলিকা। সে জানলার কাছে এসে বলল, চন্দন, এই চন্দন, ওখানে বসে আছো, নেমে এসো, শিগগির নেমে এসো—

চন্দন বলল, নামব? কেন?

বোমার শব্দ শুনতে পেলে না?

হ্যাঁ শুনলাম তো।

তাও তুমি হাঁদার মতন বসে থাকবে?

বোমা পড়লে ট্রেনের কামরার মধ্যে বসে থাকার চেয়ে নেমে দাঁড়ানোই উচিত কি না, সে সম্পর্কে চন্দন কোনও মন্তব্য করল না। তবু সে নেমে এল।

মুকুলিকা বলল, একা একা বসেছিলে কেন? দেখছ না কী কাণ্ড হচ্ছে? আজ আর ট্রেন চলবে কি না তারই ঠিক নেই।

চন্দন বলল, চলবে না?

পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের তেজ এখনও একটুও কমেনি, তবে তা এক বিশেষ দলের নেতৃত্বে চলে গেছে। অন্ধকারের জন্য দলে দলে লোক পালাচ্ছে স্টেশন ছেড়ে।

মুকুলিকা চন্দনের হাত ধরে বলল, চলো, বাস ধরতে হবে।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ওরা চলে এল স্টেশনের বাইরে।

এখন বাসে ওঠার উপায় নেই। ট্যাক্সিগুলোও সব ভর্তি। তবু কোনওক্রমে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে ঠাসাঠাসির জায়গা পেয়ে ওরা চলে এল সিঁথির মোড়ে। এ ট্যাক্সি যাবে বাগবাজারের দিকে।

এখানেও অন্ধকার। তা হলে পুরো অঞ্চলটাতেই লোডশেডিং। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তা প্যাচপেচে। আজ ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের কপালে বেশ দুঃখ আছে, কে কখন বাড়ি ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। সব বাস এই সময় এমনিতেই কুমড়ো-পাদা হয়ে আসে, তার ওপরে ট্রেনের এত যাত্রীদের ঠাঁই হবে কী করে?

এখানে অনেক চেষ্টা করেও ট্যাক্সি মিলল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে মুকুলিকা বলল, চলো, হাঁটবে?

চন্দন একটু কৌতূহলীভাবে তাকাল। মুকুলিকা কি হেঁটে ব্যারাকপুর যেতে চায়?

মন্তব্য না করে সে হাঁটতে শুরু করল।

আরও অনেক মানুষ স্রোতের মতন চলেছে, কিন্তু এ রাস্তা যে হাঁটার উপযোগী নয়। অন্ধকার, জল কাদা, খানা খন্দ। এক যুবকের পাশাপাশি চলেছে এক যুবতী, পরস্পর হাত ধরেও আছে, কিন্তু এর মধ্যে একটুও সুখরস নেই। পদে পদে হোঁচট খাবার ভয়, যাতে বিচ্ছিন্ন না হতে হয়, সেই জন্যই হাত ধরা। মাঝে মাঝে বাস বা ট্রাক যাচ্ছে জল ছিটিয়ে, ট্যাক্সিগুলোরই জল ছোটাবার কৃতিত্ব বেশি।

এর মধ্যেও দু'জন মানুষ নিঃশব্দ থাকতে পারে না।

মুকুলিকা জিজ্ঞেস করল, আজ তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরছিলে?

চন্দন বলল, হ্যাঁ, অফিসে একজনের বিদায় সম্বর্ধনা হল।

তাই দেখা হল তোমার সঙ্গে। অন্যদিন আমিও আগে আগে ফিরে যাই। আমার সঙ্গে দেখা না হলে তুমি কী করতে? ট্রেনের কামরাতেই বসে থাকতে।

কী করতাম? বেশি দেরি হলে, কী জানি, নামতেই হতো বোধহয়।

তুমি রোজ যাওয়া আসার সময়, কারও সঙ্গে তো কথা বল না, শুধু চুপ করে বসে থাক? বসে বসে কী ভাব? বই-টই পড় না?

হ্যাঁ, পড়ি।

কী বই পড়?

নানারকম, আমাদের অফিসে একটা লাইব্রেরি আছে, দিনেন্দ্রকুমার রায়ের অনেক বই।

দিনেন্দ্রকুমার রায় নামে কোনও লেখক আছে বুঝি? তুমি ইংরিজি বই পড় না?

বেশি পড়ি না। সব বুঝি না। একটা পড়লাম, ব্লাইন্ডনেস, লেখকের নামটা ঠিক মনে নেই। বোধহয় সারামাগো।

তুমি আমার মায়ের লেখা কোনও বই পড়েছ?

না পড়িনি, মানে, আমাদের লাইব্রেরিতে যদি থাকে।

আমি দিলে পড়বে? আমার ব্যাগেই আছে।

হ্যাঁ পড়ব। দিও। কত দাম?

ধ্যাৎ! আমি কি আমার মায়ের বই বিক্রি করি নাকি? এমনি পড়তে দেব। তুমি টবিন রোড চেনো?

টবিন রোড, না চিনি না।

বেশি দূর নয়। আমরা হেঁটে তো বাড়ি পৌঁছোতে পারব না। আমি বেশি হাঁটতে পারি না। টবিন রোডে আমার জেঠামশাইয়ের বাড়ি। জেঠিমা বেঁচে নেই। দুটো ছেলের কেউ এদেশে থাকে না, জেঠামশাই ভাল চোখে দেখতে পান না, অপারেশন করাতে গিয়ে আরও গোলমাল হয়েছে, একজন কাজের লোক নিয়ে থাকেন, আমাদের দেখলে খুশি হবেন। ওখানে খানিকক্ষণ বসে আমরা চা-টা খাব, তারপর একটু বেশি রাত হলে যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়, ইচ্ছে করলে রাত্তিরটা এখানে থেকেও যেতে পারি, বাড়িতে ফোন করে দেবে।

তোমার জেঠামশাই তো আমাকে চেনেন না।

তাতে কী হয়েছে? পরিচয় দিলেই তোমার বাবাকে চিনতে পারবেন। তা ছাড়া, আমার বন্ধু হিসেবেও কি তুমি যেতে পারো না?

তারপর মুকুলিকা আবার বন্ধু শব্দটা উচ্চারণ করে হেসে উঠল।

এ হাসির মর্ম বোঝার সাধ্য চন্দনের নেই।

টবিন রোডে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এসে গেল।

সরকারি ফ্ল্যাট বাড়ির সদর দরজা খোলা। দরজা বন্ধ করে রাখার দায়িত্ব কেউ নেয় না। কোন ফ্ল্যাটের কে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই, কে এসে বার বার সদর খুলে দেবে!

চন্দনকে নিয়ে মুকুলিকা দৌড়ে ভেতরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সিঁড়িটা মুকুলিকা চেনে। হাতড়ে হাতড়ে প্রথম ধাপে পা দেওয়ার পর সে বলল, চারতলায় উঠতে হবে। তোমার কাছে দেশলাই আছে?

না।

তুমি সিগারেট খাও না? দেখো, সাবধানে, আমার হাত ধরে থাকো। তুমি কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের পাল্লায় পড়েও সিগারেট খাওনি?

কেউ আমায় খেতে বলেনি।

আমি কিন্তু কয়েকবার, আমার অবশ্য ভাল লাগেনি। একটু জোরে টানলেই কাশি হয়, কেন লোকে খায়? জানো, আমার মা কিন্তু সিগারেট খায়, ড্রয়ারে প্যাকেট রাখে। দিনের বেলা কিংবা লোকজনের সামনে খায় না। কিন্তু রাত্তিরবেলা, মা যখন লেখে, একদিন আমি গন্ধ পেয়ে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখি, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, আমাকে দেখে লুকোবার চেষ্টা করছিল। কী মজার ব্যাপার, বাবা-মায়েদের দেখে ছেলেমেয়েরা সিগারেট লুকোয়, আর আমার মা... তোমাদের বাড়িতে কেউ খায় না?

শুধু আমার মেজদা... বাবাকে দেখে লুকোয়, কিন্তু মায়ের সামনে ধরাতো—

সমস্ত ফ্ল্যাটগুলিরই দরজা বন্ধ। ভেতরে জন-মনুষ্য আছে কিনা, এই অন্ধকারে তাও বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎ মুকুলিকার শরীরটা শিরশির করে উঠল। কোথাও কেউ দেখবার নেই, সে একজন পুরুষের পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, আর সিগারেটের মতন কী আজে বাজে বিষয় নিয়ে কথা বলছে? চন্দন তো নিজে থেকে কিছুই বলবে না।

তার মনে পড়লো, এই রকমই একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে সে উঠছিল পলাশের সঙ্গে, তাও রাত্তিরে নয়, দিনের বেলা, আচমকা পলাশ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার চেষ্টা করেছিল। ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াবার আগেই মুকুলিকা তাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তীব্র গলায় বলেছিল, কী হচ্ছে, উল্লুকের মতন জোর করতে চাইছ, তুমি মানুষ না?

আর এই চন্দনটা কী, এর শরীরের কোনও সাড় নেই? চন্দন যদি সে রকম কিছু করত, তা হলে ওকে একটা থাপ্পড় মেরে কিংবা ওরকম বকুনি দেবার সুখ পাওয়া যেত।

চন্দনকে একটু সুযোগ দেবার জন্য সে তিনতলার বাঁকে বলল, একটু দাঁড়াও, আমার জুতোয় কী যেন একটা ফুটেছে, পায়ে লাগছে।

নিচু হয়ে সে তার জুতোর কাল্পনিক কাঁকর সরাবার জন্য সময় নিল খানিকটা। পাশে একটা মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চন্দন।

একটু পরে উঠে দাঁড়াল মুকুলিকা।

অন্ধকারে তো যে কোনও জায়গায় ছোঁয়াছুঁয়ি হতেই পারে। আবার দু' এক সিঁড়ি উঠে সে ইচ্ছে করে চন্দনের বুকের সঙ্গে ছুঁইয়ে দিল নিজের বুক। চন্দন একটু সরে গেল।

এবার মুকুলিকা তার ঝুলন্ত ডান হাতে ছুঁয়ে দিল চন্দনের দুই উরু সন্ধিতে পুরুষাঙ্গের স্থানটিতে।

চন্দন সিঁড়ির একধাপ নেমে গিয়ে বলল, বৃষ্টি।

এখানে একটা জানলা আছে, একটা পাল্লা বন্ধ, আর একটা পাল্লা ঝোড়ো হাওয়ায় ঠকাস ঠকাস শব্দ করছে, ভেতরে আসছে প্রবল বৃষ্টির ছাঁট।

চন্দন এমনভাবে বৃষ্টি শব্দটা উচ্চারণ করল, যেন বাইরের বৃষ্টিময় আকাশ তাদের দেখছে।

মুকুলিকা বলল, এ বৃষ্টি সহজে থামবে না।

চন্দন বলল, তুমি যাও, আমি আর ভেতরে যাব না।

কেন?

আমি ফিরে যাই, একটা না একটা বাস ঠিক পেয়ে যাব।

এই বৃষ্টির মধ্যে? খানিকক্ষণ বসে আমরা দু'জনেই ফিরব। কিংবা এত কষ্ট করে না ফিরে এখানেই তো থেকে যেতে পারি। কোনও অসুবিধে নেই। এখান থেকে তোমাদের বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও!

আমাদের বাড়ির ফোন খারাপ।

ও, বেশ মিথ্যে কথাও বলতে শিখেছ দেখছি। ফোন খারাপের কথা আগে বলনি। কেন থাকতে পারবে না বল তো? একটুখানি বসতেও পারবে না?

না, আমি যাই।

কণ্ঠস্বর না চড়ালেও চন্দনের দৃঢ়তা ঠিকই বোঝা যায়। লাজুক লোকেরা হঠাৎ হঠাৎ এরকম একগুঁয়ে হয়ে ওঠে।

সে নামতে শুরু করে দিল।

অপমানে শরীর জ্বলছে মুকুলিকার। তার একবার ইচ্ছে হল, চন্দনের চুলের মুঠি ধরে সিঁড়িতে পেড়ে ফেলতে। তারপর পুরুষরা যেমন মেয়েদের ধর্ষণ করে, সেও কি তেমন পারবে না? সে চন্দনের গলা টিপে ধরে বলবে, চুপ, চ্যাঁচাবি তো লোকজন এলে বলব, তুই-ই জোর করে আমাকে—

মুকুলিকার শরীর জ্বলতে লাগল, তবু সে ওরকম কিছু চেষ্টাই করল না, দাঁড়িয়েই রইল সিঁড়িতে, তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

হঠাৎ তার মনে হল, কুবলাই খান তার জয় করা রাজ্যগুলির কোনও একটা থেকে চার-পাঁচশো মেয়ে ধরে আনতো প্রতি বছর। তারপর তাদের মধ্য থেকে নিখুঁত সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী জনা চল্লিশটিকে বেছে রেখে বাকিদের বিলিয়ে দেওয়া হত তার পারিষদদের মধ্যে। ওই চল্লিশজন হতো এক বছরের জন্য কুবলাই কানের শয্যাসঙ্গিনী। পরের বছর ওদের ভাগিয়ে দিয়ে অন্য রাজ্য থেকে আবার।

মেয়েরা কি কোনওদিনও এর প্রতিশোধ নিতে পারবে না?

ছয়

চন্দন ওরকমভাবে চলে গেল কেন? বৃষ্টি শব্দটি উচ্চারণ করে কি সে বোঝাতে চাইল, সে বৃষ্টিতে ভিজতে চায়, এখন বৃষ্টিতে ভেজাই তার কাছে সবচেয়ে আনন্দের?

মুকুলিকাকে সে ভয় পেয়েছে? ভয় পাবার কি কারণ আছে, অল্প বয়েস থেকে সে মেয়েটিকে চেনে।

মেয়েদের সম্পর্কে তার যে একেবারে আকর্ষণ নেই তাও নয়। সে মেয়েদের ছবি দেখতে ভালবাসে। পত্রপত্রিকায় মেয়েদের ছবির দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, মেয়েদের মুখের নানা রকম হাসির তুলনা করে মনে মনে। পুরুষ হিসেবে তার শারীরিক বা মানসিক কোনও খুঁতও নেই। সিনেমায় কোনও নারী-পুরুষের অতি ঘনিষ্ঠ শারীরিক দৃশ্য দেখলে তার মস্তিষ্কে সঠিক যৌন আবেগের সঞ্চার হয়, তারপর শরীর বেয়ে সেই আবেগ তার পুরুষাঙ্গে সাড়া জাগায়।

তবু সে কোনও বাস্তব মেয়ের সঙ্গ কামনা করে না, ছল ছুতোয় কারুর শরীর ছুঁতে চায় না, তার কারণ সে একটি রমণীকে ভালোবেসে ফেলেছে। হয়তো একে ভালবাসা বলেও না, চন্দনের সবই তো বিসদৃশ, সেই রমণীকে চন্দন দেখেছে মাত্র একবার, এবং খুব সম্ভবত সারা জীবনেও আর দেখা হবে না।

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে।

চন্দনের কলেজ জীবনে যে দুজন মাত্র সহপাঠীর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, তাদের মধ্যে পল্লবের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে দেখা হয়, পল্লবের বাড়িতেও গেছে অনেকবার। হরিশ মুখার্জি রোডে পল্লবদের পুরনো পুরুষানুক্রমিক বাড়ি। এখনও টিকে আছে যৌথ পরিবার। বাড়ির সামনে রয়েছে যক্ষপুরীর দ্বারপালের একটি চুনা-পাথরের মূর্তি, পল্লবের ঠাকুরদার বড়ভাই শখ করে গড়িয়েছিলেন, এখন পাড়ার ছেলেরা উৎকট কৌতূহলে মাঝে মাঝেই সেই মূর্তিটার নাক আর কান দুটো ভেঙে দিয়ে যায়, একবার মার্বেলের একটা চোখও ঘুবলে নিয়ে যায়। যা ভাঙে তার কোনও আর্থিক মূল্যের দাম নেই ওদের কাছে, তবু ভাঙে। পল্লবের বাবারও এমন জেদ, তিনি এ যুগেও কিছুতেই বাতিল করতে চাননা মূর্তিটাকে, প্রত্যেকবার আর্ট কলেজের কোনও ভাস্কর্যের ছাত্রকে ডেকে এনে সারিয়ে তোলেন।

পল্লবের ধারণা, ওই দ্বারপালের মুখের সঙ্গে তার বাবার মুখের মিল আছে। ওই রকমই পাকানো মোটা গোঁফ, কান দুটোও বড় বড়, বাবরি চুলে খানিকটা ঢাকা থাকে।

গেটের পর ভেতরে এক চিলতে বাগান, তারপর উঁচু কাঠের দরজা। একতলায় উঠোন ঘিরে খুপরি খুপরি ঘর, সেখানে কাজের লোকেরা থাকে, এক পাশে বৈঠকখানা। দোতলা-তিনতলায় বড় বড় ঘরের সংখ্যা অনেক, পরিবারের সদস্যওতো অন্তত কুড়ি-বাইশজন। বউবাজারে একটি গয়নার দোকান আর মিনিবাসের ব্যবসা আছে বলে অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল।

যৌথ পরিবার যদি অটুট থাকে আর অনটনের মধ্যে না পড়ে, তবে তার কিছুটা সুফল পাওয়াই যায়। বাড়ির একজন দু'জন অর্থ উপার্জনের জোয়াল কাঁধে না নিয়ে বিদ্যা-জ্ঞানচর্চায় কিংবা সঙ্গীত-শিল্পে মন দিতে পারে। চন্দনের এক কাকা এমন এক বিষয়ের পণ্ডিত যার সঙ্গে এই পরিবারের ইতিহাস কিংবা জীবিকার কোনও সম্পর্কই নেই, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক, এমন সব মোটামোটা ইংরিজি বই লেখেন ও নিজের খরচে ছাপেন, যা বিশেষ কেউ পড়ে না, শুধু তাঁর মতন অল্প কিছু দার্শনিকই বোধে এবং বিদেশে সমাদর হয়।

চন্দনের ছোট কাকা উচ্চ মাধ্যমিকে ব্রাকেটে তৃতীয় হয়েছিলেন, তারপর খড়্গপুর আই আই টি-তে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম হন। তিনি অবশ্য অন্য কোনও জ্ঞানের চর্চা করেননি, তবে তাঁর স্ত্রী সত্যিকারের বিদুষী। এই কাকার নাম সুশোভন, কাকিমার নাম মাধুরী।

ছাদটা এতই বড় যে শীতকালে ওখানেই নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হয়, বাচ্চারা ফুটবলও খেলে। আর মাঝে মাঝে শিকনিক লেগেই আছে। ছাদের এক তৃতীয়াংশ সারা বছরই ত্রিপল দিয়ে ঢাকা থাকে।

একবার পল্লব তার কয়েকজন বন্ধুকে কাকুতি-মিনতি করে নেমন্তন্ন করেছিল, প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, সেদিনই যেতেই হবে, যেতেই হবে। কারণটা অদ্ভুত।

চন্দনের ছোট কাকার এক বন্ধু সিরাজুল লস্করৌধ নবাব বংশের সরাসরি বর্তমান প্রজন্ম, তিনিও অবশ্য এখন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহাদের একটা প্রজেক্টে এক সঙ্গে কাজ করায় সময় দু'জনের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়।

তিনি গান-বাজনারও চর্চা করেন, অনেক মঞ্চে ঠুংরি পরিবেশন করেছেন। বংশের খানদান অনুযায়ী তিনি আবার প্রচণ্ড খাদ্যরসিক। কলকাতায় আমির আলি এভিনিউতেও তাঁদের একটি বাড়ি আছে।

সেই সিরাজুলের সঙ্গে একদিন খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে আলোচনা হতে হতে তিনি বারবার বলছিলেন, তাঁদের বাড়িতে এক ধরনের গোস্ত রান্না হয়, যার স্বাদ বাঙালিরা জানেই না, একবার খেলে জীবনে ভুলতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে কেউ না কেউ বলবেই, একবার খাইয়েই দেখো না ভাই। শুধু মুখের কথা শুনে কি কিছু বোঝা যায়? শরীরে নবাব বংশের রক্ত, এ ধরনের কথা শোনা মাত্র তেজ জ্বলে ওঠে। তিনি বললেন, এ আর এমনকি বড় কথা, ব্যবস্থা কর। কালই খাওয়াব, আমার বাড়ি থেকে রান্না হয়ে আসবে, তোমাদের কিছু খরচ করতে হবে না। বিরিয়ানি আর হান্ডি গোস্ত্ আমি আনব।

তা হলে আর কী ব্যবস্থা করতে হবে? সিরাজুলের নিজের বাড়িতে এক ভাবীর সবে মাত্র যমজ বাচ্চা হয়েছে, সুতরাং সে বাড়িতে এখন হৈ চৈ চলবে না। খাওয়া দাওয়া হবে সরকার বাড়ির ছাদে, কাগজের প্লেটে এ খাদ্য মানায় না, থালা-গেলাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর... এটাই আসল শর্ত, এই হান্ডি কাবার অল্প রান্না করা যায় না, একটা বড় হাঁড়ি ভর্তি করে, মুখ চাপা দিয়ে ছ'ঘণ্টা ধরে পরিপাক করতে হয়, তাতেই আসল স্বাদ আসে, সেই মাংস অন্তত আশি জন লোক খেতে পারে। লোক কম পড়লে নষ্ট হবে, কারণ এই মাংস ফ্রিজে রাখলে পরদিন অখাদ্য হয়ে যায়।

আশি জন লোকের উপযোগী মাংস রান্না? সেটা কত বড় হাঁড়ি? সিরাজুল বললেন, সে আনার পর দেখবে। এখন লোক জোগাড় করো, অনেক মেহনত ও খরচ করে যা রান্না হবে, তা নষ্ট হলে বড়ই আফসোসের ব্যাপার হবে।

একদিনের নোটিসে আশি জন লোক পাওয়া যাবে কী করে? সিরাজুল তার পরের দিনই ভাইজাগ চলে যাচ্ছেন, সেই জন্য পিছিয়ে দেবারও উপায় নেই। সুতরাং এ পরিবারের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যে-যেখানে আছে, সবাইকে পেড়াপিড়ি করতে হয়েছিল। পল্লব নিজে চন্দনকে প্রায় জোর করেই ধরে এনেছিল।

সে একটা এলাহি কাণ্ড বটে। এ খাবার গরম গরম খেতে হবে এবং দ্বিতীয়বার গরম করা যাবে না। সুতরাং সব অতিথিরা জড়ো হবার পর ফোন করে জানালে, আমির আলি এভিনিউর বাড়ি থেকে গাড়ি করে আনা হবে খাদ্য এবং পরিবেশন করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। হাণ্ডিখানার সাইজ দেখেই চক্ষু চড়ক গাছ হবার জোগাড়, নবাব-বাদশা-রাজা-মহারাজাদের নামগুলো লম্বা লম্বা হয়, সিরাজুলেরও পুরো নাম লিখতে দেড় লাইন লাগবে অন্তত, এবং এদের বাড়ির সব জিনিসপত্রও সাধারণ মানুষদের তুলনায় অতিকায় হয়। পঞ্চ ধাতুতে তৈরি সেই গোস্তের হাণ্ডিটা পাঁচজন লোক মিলে কাঁধে করে তুলল ছাদে। তারপর অন্য কয়েকটা ছোট হাঁড়িতে বিরিয়ানি।

দুঃখের বিষয় বিকেল থেকেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি, তাই যারা সম্মতি জানিয়েছিল, সেই আমন্ত্রিতরাও সবাই এল না। মোটে ছাপ্পান্ন জন এবং এত মাংস যে আশি কেন, একশো কুড়ি-পঁচিশজন লোকও খেয়ে শেষ করতে পারত না। গরুর গোস্তের বদলে খাসির মাংসই রান্না করিয়েছিলেন সিরাজুল, তা খেয়ে সবাই ধন্য ধন্য করল, কিন্তু সিরাজুলের মতে ঠিক যেন তেমনটি হয়নি।

চন্দন খাদ্যরসিক নয়, বাড়ির রান্না নিয়ে কোনও দিন সে নাক ছাঁটা দেখায়নি। সুবোধ বালকের মতন যা দেওয়া হয় তাই-ই খায়। সে এ রান্নার বিশেষত্ব কিছু বুঝতে পারল না। অল্প একটু মাংস মুখে দিয়ে অতিরিক্ত ঘি ও চর্বির জন্য তার মুখ মরে এল, বরং বুরহানি নামে এক রকম সরবত দিচ্ছিল সঙ্গে। সেটাই সে খেয়ে ফেলল তিন চার গেলাস।

এত খাবার যে বেঁচে গেল, তা কী হবে? অতিথিদের বলা বল, কিছু কিছু বাড়িতে নিয়ে যেতে, অনেকেই রাজি নয়। আসলে পাতলা কচি পাঁঠার ঝোল আর কুচো মাছ খেয়ে খেয়ে বাঙালিদের হজম শক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম দুর্লভ, দুর্মূল্য, নানা প্রকার মশলা-ঘি-চর্বি মিশ্রিত ধনী রান্না অনেকেই ঠিক পছন্দ করেনি, বরং মনে মনে একটু ভয় পেয়েছে। তবে কি বাকিটা রাস্তার ভিখিরিদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে? তাতে সিরাজুলের ঘোর আপত্তি। তিনি ভিখিরিদের টাকা পয়সা দিতে রাজি আছেন, কিন্তু এ হাণ্ডি গোস্ত, এ এমনই এক মহার্ঘ বস্তু, যা বেরসিকদের মধ্যে কিংবা অপাত্রে দান করলে রন্ধন শিল্পীরই অপমান। এ নিয়ে খুব তর্কবিতর্ক ও হাসাহাসি চলেছিল, শেষ পর্যন্ত তার কী পরিণতি হল, তা চন্দন জানে না।

বুরহানি পরিবেশন করছিলেন পল্লবের ছোট কাকিমা মাধুরী। এটা কোনও বিশেষ উপলক্ষের নেমন্তন্ন নয়। হঠাৎ খাওয়া-দাওয়া, তাই বাড়ির মেয়েরা বিশেষ সাজগোজ করেনি, বাইরে থেকে যারা এসেছে তারা তো কিছু না কিছু সাজবেই, তাই দু'দলের বেশ পার্থক্য বোঝা যায়। বসার জন্যও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হয়নি। খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে যে-যেখানে পারছে বসে পড়েছে, বৃষ্টির জন্য অনেকে নেমে গেছে তিনতলায় বিভিন্ন ঘরে। ওপর থেকে মাঝে মাঝে কেউ কেউ নেমে এসে বলছিলেন, তোমাদের আর কিছু লাগবে, নাও না, এত খাবার রয়েছে...।

মাধুরীর বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, অথচ রোগা মনে হয় না। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, এই ধরনের ধাতুর ফ্রেম ইদানিং দেখা যায় না, মাথার চুল নিবিড় ভাবে কোঁকড়ানো, এমনই চাপ বাঁধা ঘন চুল যে পরচুলা বলে মনে হতে পারে। অবশ্যই তা নয়। প্রায় আটপৌরে একটা শাড়ি পরা, সাদার ওপর লাল ডুরে, ব্লাউজটি লাল রঙের। এখন কোনও শহুরে মেয়েরই স্বাভাবিক ভুরু থাকে না, প্লাগ করে কিংবা চেঁছে সরু করা হয়। এবং এ রকম ধনুকের মতন ভুরুই মেয়েদের বেশি মানায়, তাতে দৃষ্টিবাণ সহজে বেরিয়ে আসে। মাধুরীর ভুরুতেও পরিচর্যা আছে, কিন্তু খুব সরু নয় এবং প্রায় যুগ্ম ভুরু। বয়েসের বিবেচনায় তাঁকে যুবতী বা তরুণী বলতে হয়, কিন্তু নারী বললেই যেন বেশি মানায়, তাঁর মুখে যেন আবহমানকালের ছাপ আছে।

একটা রুপোর জগ হাতে নিয়ে মাধুরী এক একবার এসে জিজ্ঞেস করছিলেন, আর কার সরবত লাগবে, কার লাগবে? পল্লব তার পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে বসেছে নিজের ঘরে। একমাত্র চন্দনই প্রত্যেকবার গেলাস বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্তত চারবার। বুরহানির স্বাদ তার এত ভাল লাগছে, শুধু সেই জন্যই কিংবা গেলাসে ঢেলে দেবার জন্য মাধুরী তার সামনে একটুক্ষণ দাঁড়াবেন, সেটাই চায় চন্দন? কিংবা দুটোই সমান কারণ।

সেদিনের সমাবেশে কুমারী ও বিবাহিতাদের মিলিয়ে মেয়েদের সংখ্যা পঁচিশ ছাব্বিশজন তো হবেই। প্রথম থেকে চন্দন শুধু মাধুরীকেই দেখছে। তার কারণ এই নয় যে সকলের মধ্যে মাধুরীই সবচেয়ে রূপসী। রূপ তো আর নিক্তিতে মাপা যায় না। চন্দনও এমন কিছু রূপের সমজদার নয়। সে মাধুরীর পুরো মুখটাও দেখছে না ভাল করে, দেখছে শুধু একটা কান।

মাধুরীর এক হাতে একটা শুধু সরু ব্যান্ডের ঘড়ি, কোনও অলঙ্কার নেই। গলায় নেই হার। এক কানে একটা লাল পাথরের দুল, অন্য কানটা ফাঁকা। লাল পাথরটা নিশ্চয়ই চুনি। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি চুনি পান্নার তফাত না বুঝলেও অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা জানে, 'আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে'।

চতুর্থ গেলাসের সময় মাধুরী বিস্ময়মাখা কৌতূহলে ভুরু তুলে বললেন, তোমার বুঝি এই সরবতটা এতই ভাল লাগছে? আমারও মনে হচ্ছে যেন, এলিক সা-র অফ লাইফ।

চন্দন এলিক সা-র শব্দটার মানে জানে না। মনে মনে মুখস্থ করতে লাগল। বাড়ি গিয়ে অভিধান দেখবে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চোকার পরেও ভাঙা আসর চলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত। পল্লব তার বন্ধুদের ধরে রেখেছিল, কেন না বৃষ্টি থামেনি। অন্য একটা ঘরে শুরু হয়েছিল গান-বাজনা এ ঘরে পল্লবের এক বন্ধু, যে সদ্য রেডিওতে চাকরি নিয়েছে এবং উঠতি আবৃত্তিকার, গড়গড় করে মুখস্থ শোনাচ্ছিল অনেক কবিতা, এক সময় মাধুরী এসে যোগ দিলেন। এক সময় পল্লব পেড়াপিড়ি করতে লাগল, কাকিমা, তুমি একটা কবিতা বলো। তোমার তো অনেক মুখস্থ থাকে। খুব বেশি সাধতে হল না, একটু চোখ বুঁজে নিয়ে, আবার চোখ খুলে মাধুরী বলতে লাগলেন... যদিও তিনি ইংরিজির ছাত্রী এবং অ্যাংরি ইয়াং মেন নামে লেখকগোষ্ঠীর সাহিত্য নিয়ে সম্প্রতি পি এইচ ডি করেছেন, তবু নির্ভুল আবৃত্তি করে গেলেন জীবনানন্দ দাশের 'নগ্ন নির্জন হাত'।

তারপর কখন যেন কবিতা থেকে গল্প শুরু হয়ে গেল। চন্দন তো মাধুরীর কবিতাও পুরো মন দিয়ে শোনেনি। সে দেখছিল একটি কান,

যে-কানে চুনির দুল আছে, সেটা নয়। অলংকারহীন কানটার আকর্ষণীই তার কাছে বেশি। এক কানে দুল পরা কোনও রমণীকে সে আগে দেখেনি।

মাধুরী যা বলছিলেন, তার মধ্যে কানের প্রসঙ্গ আসায় চন্দন সচকিত হয়ে উঠল।

পল্লবের ছোটকাকা ভাইজাগে একটা প্রজেক্টের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কয়েক বছর। মাধুরী ওখানে থেকেই গবেষণা করে পি এইচ ডি'র থিসিস শেষ করে একটা কলেজে লেকচারারের চাকরি পেয়েছিলেন। এবার স্বামী-স্ত্রী চলে যাচ্ছেন আফ্রিকার সিয়েরা লিওন-এ, মাধুরী তিনবার জোর দিয়ে বললেন, তিনি জীবনে আর কখনও ভাইজাগে ফিরে যেতে চান না।

গল্পের শুধু এই অংশটা চন্দনের মনে পাথরে খোদাই লিপির মতন দাগ কেটে বসে গেল।

...আমাদের ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর ছিল, জানিস, প্রায় বিচের ওপরে, তিনতলায়, একটা বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালে ঢেউয়ের শব্দও শোনা যায়, মাঝে মাঝে রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতুম, রাত্তিরের রূপ অন্য রকম, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের রেখা, ঠিক ছড়ানো মালার মতো, দেখলেই মাইকেলের কবিতার লাইনটা মনে পড়ে, কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেত... অবশ্য ও কবিতায় 'সুন্দর' কথাটার মানে অন্য রকম, রাত্তিরে বারান্দার দিকে দরজাটা খোলাই রাখতুম, হু হু করা হাওয়া, কোনওদিন ভাবিনি যে ওই বারান্দায় কোনও লোক উঠে আসতে পারে... লোকটা খবর নিয়েই এসেছিল, সেইদিনই তোমার কাকা অফিসের কাজে হায়দরাবাদ গেছে, ফ্ল্যাটে আমি একা, রাত প্রায় দুটো আড়াইটে হবে। সেই সময়টাতেই তো গভীর ঘুম হয়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, কোনও শব্দ শুনিনি, এমনি এমনি জানিস তো, নিজের স্বামী যদি ঘরের মধ্যে মাঝরাতে ঘোরাফেরা করে, দুমদুম শব্দও করে, তাও মেয়েদের ঘুম ভাঙে না। কিন্তু অন্য কোনও লোক যদি পা টিপে টিপেও ঘরে ঢোকে, তাহলেও মেয়েদের... চোখ মেলেই দেখি একটা লোক বারান্দার দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে, আমি ধড়মড় করে উঠে বসতেই সে লোকটা ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বলল, একদম চুপ থাকবি, না হলে জানে মেরে দেব, টু শব্দ করবি না!

আবৃত্তিকারটি প্রশ্ন করল, বাঙালি? বাংলায় বলল?

মাধুরী বললেন, না, মানে বাঙালি কিনা জানি না। তবে কথা বলল তেলেগুতে, আমি তেলেগু ভাষা মোটামুটি বুঝি, ভয়ে আমার বুক ধকধক করছে, প্রথমেই মনে হল, লোকটা কী চায়। ও কি গয়নাগাঁটি নিতে এসেছে, না রেপ করবে? ছোটবেলা থেকে আমার দুল পরার শখ, আর কিছু গয়নাগাঁটি পরি না। বাড়িতে গয়নাটয়নাও বিশেষ নেই, সব তো ব্যাঙ্কের লকারে, ক্যাশ টাকাও... সবই তো চেকে, তিন-চার শো টাকার বেশি নেই... এ চোরটা তো কিছুই পাবে না, তাতে রেগে গিয়ে যদি... চোরটা বলল, গয়না খুলে দে! আমি কান থেকে দুল খুলছি, এই রকম সময়ে হাত কাঁপে, একটা দুল খুলতেই দেরি হচ্ছে। লোকটা অন্য কানের দুলটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, কানটা কেটে গিয়ে, আমি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলুম। উঃ মা গো, তখন লোকটা বলে কী, চ্যাঁচালি যে মাদী কুত্তী... আচ্ছা দ্যাখ। অত ব্যথা লাগল। কান ছিঁড়ে রক্ত বেরুচ্ছে, এমনি এমনিই তো গলা থেকে... তারপর লোকটা একটা ছুরি তুলল, ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, কাছাকাছি বোধহয় পূর্ণিমা ছিল, আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, লম্বা ছুরিটা... আমার ধারণা ছিল চোর-চোরদের কাছে ছুরি থাকে না। চোর আর খুনিরা তো আলাদা হয়, কিন্তু এই লোকটা যে ঠিক কী, আমি আবার বোকার মতন বলে ফেললুম, আমার কাছে তো বিশেষ কিছু নেই, সে তখন ছুরিটা তুলে...

মাধুরীর মুখটা একেবারে বদলে গেছে, তিনি এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ এখানে নেই। একটা চরম বিপদের কথা বলছেন, তবু তিনি হাসছেন।

তিনি বলতে লাগলেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। লোকটা ছুরি হাতে যখন মারতে এলো। আমি ভাবলুম, তা হলে কি আমি মরেই যাব, হা-হা-হা, সত্যি সত্যি কেউ জানবে না। এইভাবে ডেথ আসবে আমার কাছে, হা-হা-হা, আজই সব শেষ, একটা চিঠি আধখানা লেখা আছে, শেষ হবে না... হা-হা-হা এ রকম হয়? আমি...

ঠিক এই সময়েই মদনদেব একটা তীর হানলেন চন্দনের বুকে।

ঘটনাটার নিষ্ঠুরতা বা বিপদের দিকটা অনুভব করার চেয়েও সে বেশি মুগ্ধ হয়ে গেল মাধুরীকে দেখে। এরকম মুখ সে জীবনে কখনও দেখেনি, এ রকম হাসি সে কখনও শোনেনি।

ঘটনার বাকি অংশটা সে ভাল করে শুনলই না। আততায়ীটি সত্যিই ছুরি মারল মাধুরীকে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, তারপরে ও কী যেন হয়েছিল, সে সব চন্দনের মনে নেই। সে শুধু চোখ দুটিকে স্বাভাবিকের চেয়েও দ্বিগুণ করে চেয়ে রইল মাধুরীর মুখের দিকে, সে মুখে একই সঙ্গে ফুটে উঠছে মৃত্যু ভয় ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করা হাসি।

এ রকম একটা ঘটনা শুনলেই শ্রোতাদের মধ্যে কারও কারও অন্য ঘটনা মনে পড়ে। যেমন একজনের অসুখের প্রসঙ্গে অন্য অনেকের অসুখের কথা আসে। এখানে একজন বলতে শুরু করল, আমার দাদা-বউদি যখন কানপুরে থাকত, তখন একবার...

মাধুরী এসে দাঁড়িয়েছেন জানলার ধারে। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখের প্রোফাইল। যেন মদিগ্লিয়ানির আঁকা কোনও নারী। রং নেই, চারকোল স্কেচ। চন্দন সে দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

মাধুরী আপন মনে বললেন, বৃষ্টি ধরে এসেছে।

এবারে বিদায় নেবার পালা। অন্য কথকের গল্প মাঝপথে থামিয়ে সবাই উঠে পড়ল।

চন্দন মাধুরীর কাছে গিয়ে মৃদু গলায় বলল, যাই।

মাধুরী বললেন, এসো—।

মাধুরী কি টের পেয়েছিলেন যে তাঁর থেকে কমবয়েসী এই ছেলেটি এর মধ্যে তাঁকে পাগলের মতন ভালোবেসে ফেলেছে? অনুভূতির হয়তো তরঙ্গ আছে। মেয়েরা যেমনভাবে পরপুরুষের উপস্থিতি টের পায়। সেই ভাবে কারও গোপন ভালোবাসাও শরীরে অনুভব করে?

না হলে, অন্য কারওকে না, শুধু চন্দনের হাতটা তিনি একবার ছুঁয়ে দিলেন কেন? ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, এসো—।

চন্দনের জীবনে যেন সেই প্রথম নারী স্পর্শ। আর কোনও নারীর সঙ্গে এই স্পর্শের তুলনাই হয় না। এই জন্যই আর কোনও নারীর স্পর্শ পেতেও তার ইচ্ছে করে না।

তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। মাধুরীর সেই মুখ ও হাসি একই রকমভাবে, রয়ে গেছে চন্দনের মনে। সেই স্পর্শও একই রকম তীব্র।

সাত

চন্দনের অফিস হাওড়া ময়দানের কাছেই। কারখানা আর কার্যালয় এক সঙ্গে। চন্দন যদিও বিজ্ঞান পড়েছে, কিন্তু ভালো অঙ্ক জানার সুবাদে সে কাজ করে অ্যাকাউন্টস বিভাগে।

কম্পানিটি ছোট, মোট কর্মীর সংখ্যা অফিসার ও দারোয়ান-পরিচারক সমেত পঁয়তিরিশ। এর মালিক পরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়েস আশি ছাড়িয়ে গেছে। প্রাক-স্বাধীনতা আমলের আদর্শবাদী মানুষ, কেমিস্ট্রিতে এম এস-সি পাশ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় বাঙালির ব্যবসা করা উচিত ভেবে চাকরি না নিয়ে এই কারখানাটি শুরু করেছিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, দেশের মানুষকে শস্তায় ওষুধপত্র জোগানো।

এতে তিনি অনেকটা সার্থকও হয়েছিলেন, দুটি পেটের অসুখ আমাশার ওষুধ আর খোস-পাঁচড়ার একটি মলম এক সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। উৎপাদনের চেয়েও চাহিদা ছিল বেশি। এখন অন্যান্য কম্পানির প্রতিযোগিতা এসে গেছে। তা হলেও শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ওষুধগুলো ভালোই চলে, শস্তার কারণে।

সম্প্রসারণ ছাড়া কোনও ব্যবসাই বেশিদিন টিকতে পারে না। পরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শুরু করেছিলেন মাত্র পাঁচজন কর্মী নিয়ে, অর্ধশতাব্দীতে সেই সংখ্যা পৌঁছেছে পঁয়তিরিশে। তারপর থমকে গেছে। পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলো বদলে ফেলে আধুনিক ব্যবস্থা করা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় পরমেশ সে ব্যাপারে সচেতন। টাকা-পয়সারও জোগাড় হতে পারত। কিন্তু তিনি হারিয়ে ফেলেছেন উৎসাহ।

যে-কারণে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বিশাল ব্যবসা এক সময় উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, পরমেশের অবস্থাটাও তাই। তাঁর সন্তান

সন্ততিরা কেউ তাঁর এই কারখানা পরিচালনার ভার নিতে এগিয়ে এল না। তাঁর ছেলে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়েসে হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত হয়ে তিন দিনের জ্বরে মারা যায়। জীবিত অবস্থাতেও সে ছিল অমিতব্যয়ী এবং অস্থিরচিত্ত বড় নাতি প্রসেনজিৎ পড়াশুনোয় খুব ভাল। তাকে পরমেশ বিলেতে পাঠালেন ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসার জন্য। বন্ধুদের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে সে এক মোহময়ী আমেরিকান তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে আকর্ষণ প্রধানত শারীরিক। আমেরিকান মেয়েটি এক ক্যাথলিক পরিবারের, তাদের মতে গর্ভজল নষ্ট করা অতি সাঙ্ঘাতিক পাপ। সুতরাং প্রসেনজিৎ আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাল্টিমোর শহরে সংসার পেতে বসল। এখন তার নাম শুধু জিটু, শ্বশুরের কনস্ট্রাকশান কম্পানিতে কাজ করে, সে আর দেশে ফিরবে না।

পরমেশ ছোট নাতিকে আর বিদেশে পাঠাতে চাননি। কিন্তু বিশ্বজিৎও পড়াশুনোয় দুর্ধর্ষ হলো আর নিজের চেষ্টাতেই ইংল্যান্ডের শেফিল্ডে জোগাড় করে ফেলল একটা স্কলারশিপ, শুধু বিমান ভাড়াটা দাদুর কাছ থেকে নিতে হবে। পরমেশ প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেন, বিশ্বজিৎ তখন ধরল তার মাকে। বিধবা পুত্রবধূর অনুরোধ আর অগ্রাহ্য করতে পারলেন না পরমেশ, কিন্তু বিশ্বজিৎকে তার দাদুর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হল, তিন বছরের মধ্যে তাকে ফিরে আসতে হবে।

শপথ ভঙ্গ করেনি বিশ্বজিৎ, ফিরে এসেছিল ঠিকই, তবে সেই সময়েই কারখানাটিতে স্ট্রাইক চলছে একজন কর্মীকে সাসপেন্ড করার অজুহাতে। ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটও শুরু হয়েছে। বাধ্য ছেলের মতন বিশ্বজিৎ কারখানায় যেতে শুরু করলো, কলকাতা থেকে হাওড়ায় পৌঁছোতে ট্রাফিক জ্যাম হয় প্রায়ই। বৃষ্টির সময় অবস্থা আরও খারাপ হয়, কারখানার চারপাশে নোংরা-কাদা, পরিবেশ মোটেই সুন্দর নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া ও বিলেতে তিন বছর কাটিয়ে আসা কোনও যুবক যদি এই পরিবেশ দেখে নাক কুঁচকোয়, তবে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি।

বিশ্বজিৎ একদিন তার দাদুকে কারখানাটির উন্নয়ন পরিকল্পনা সবিস্তারে পেশ করল। পুরনো যন্ত্রপাতি সব বদল করে কারখানাটি নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এটা অটোমেশানের যুগ, আপাতত ছাঁটাই করতে হবে অন্তত আটজনকে, এক বিশেষ অবাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে পার্টনারশিপে যাওয়া খুব জরুরি, তাতে আরও ক্যাপিটাল আসবে, এবং সমগ্র কারখানাটিই আমেদাবাদে তুলে নিয়ে যাওয়া উচিত।

পরমেশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের যেন আদর্শবাদ বলতে কোনও ব্যাপারই নেই। কারখানাটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের কথা বিশ্বজিৎ গ্রাহ্য করে না। ওসব পুরনো আমলের ব্যাপার, এখন প্রতিযোগিতার যুগ, লাভ-ক্ষতিই প্রধান বিবেচ্য।

পরমেশ বললেন, আধুনিকীকরণ বা অটোমেশান চালু করাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু একটি কর্মীকেও ছাঁটাই করা চলবে না, তাদের অন্য কাজে লাগাতে হবে। কারও সঙ্গে পার্টনারশিপের যাবার প্রয়োজন নেই, আর আমেদাবাদে কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

দাদু-নাতির তর্ক বিতর্ক চললো কয়েকদিন, তারপর তা পর্যবসিত হল তিক্ততায়। হাওড়ায় এঁদো পচা পরিবেশে ভবিষ্যতহীন একটা কারখানায় বিশ্বজিৎ তার জীবন বাঁধা দিতে মোটেই রাজি নয়।

আমেদাবাদের প্রতি বিশ্বজিতের পক্ষপাতিত্বের একটি বিশেষ কারণও আছে। ইংল্যান্ডে থাকার সময় বিশ্বজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় একটি আফ্রিকা-ফেরত গুজরাতি প্যাটেল পরিবারের। পূর্ব ইংল্যান্ড জুড়ে এক ওষুধের চেইন স্টোরসের এঁরা মালিক। এঁরা এঁদের পূর্ব পুরুষের ভিটে আমেদাবাদেও একটা ওষুধের কারখানা স্থাপন করতে চান। সুদর্শন, বুদ্ধিমান, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর বিশ্বজিৎকে এই পরিবারের অধিপতির বিশেষ পছন্দ। বিশ্বজিৎকেই তিনি সেই নতুন কারখানাটি গড়ে তোলার পুরো দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঠিক করেছিলেন। তার আগে অবশ্য এঁরা বিশ্বজিৎকে একটি কন্যা দান করে ঘর-জামাই করে নেবেন। ঘর-জামাই প্রথা এঁদের মধ্যে এখনও বেশ প্রচলিত, তাতে ব্যবসার পরিচালনাও নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ইংল্যান্ড থেকে বিশ্বজিৎ ফিরে আসার পরেও এঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন। হাওড়ার কারখানাটা গুজরাতে তুলে নিয়ে যাবার পরামর্শও তাঁদের। ওই শর্তে তাঁরা পুরনো কারখানাটির জন্যও টাকা ঢালতে রাজি।

পরমেশের একগুঁয়েমির জন্য তা সফল হল না। বিশ্বজিৎ তার মা অনুসূয়াকে নিয়ে চলে গেল গুজরাত।

বাকি রইল মেয়ে-জামাই পরমেশের মেয়ে রেশমির বিয়ে হয়েছে উত্তর কলকাতার এক পুরনো পরিবারে। সে পরিবারটি এখন এতই অধঃপতিত যে পচা গন্ধ বেরোয়। রেশমির ভাগ্যটা খুবই খারাপ, পরপর তিনটি কন্যা সন্তান জন্মানোতে শ্বশুরবাড়িতে তার একটুও সম্মান নেই। পরমেশ তাঁর মেয়ে ও জামাই অতনুকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন উত্তর কলকাতা ছেড়ে চলে আসার জন্য, তিনি তাদের একটি ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন পার্ক সার্কাসে। অতনু রাজি হয়নি। শোভাবাজারে পৈতৃক বাড়িতে তার অনেকখানি অংশ আছে। দুই কাকার সঙ্গে মামলা চলছে বলে সে অংশটা সে বিক্রি করতে পারছে না। একবার সে-বাড়ি ছেড়ে চলে এলে সে আর সেখানে ঢুকতেই পারবে না। নিজের অধিকারও হারাবে।

পরমেশ অতনুকে প্রথম থেকেই নিজের কারখানায় অন্যতম ডিরেকটর করে নিয়েছিলেন। অতনু নিছক বোকাও নয়। বুদ্ধিমানও নয়। বরং যাকে বলে বোকা-চালাক, অর্থাৎ বিপজ্জনক। সে অকর্মণ্য এবং দুর্মুখ, কারখানার কোনও কর্মীর সঙ্গেই সে সহজভাবে মিশতে পারেনি। সব সময় একটা নকল আভিজাত্যের দূরত্ব বজায় রেখেছে। পরমেশ নিজে অনেক সময় কারখানার শেডে গিয়ে অন্য কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে মেশিনে হাত লাগান। অতনু কখনও কারখানার দিকটায় পা-ই দেয়নি। পরমেশকে না জিজ্ঞেস করে সে একবার একজন কর্মীকে সাসপেন্ড করে বসে, তার ফলেই স্ট্রাইক হয়। সে স্ট্রাইক মেটাতে গিয়ে পরমেশ অতনুকে কম্পানির অফিসে যেতেই নিষেধ করে দেন, তার প্রাপ্য টাকা প্রতি মাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে।

অর্থাৎ পরমেশের পাশে দাঁড়াবার মতন কেউ নেই।

এই বিরাশি বছরেও তাঁর স্বাস্থ্য ভালই আছে, প্রতিদিন ঠিক সময়ে এসে হাজির হন কারখানায়। বেঁটে খাটো, শক্ত চেহারার মানুষটি, ধুতি ও হাফ হাতা পাঞ্জাবি তাঁর বরাবরের পোশাক। কারখানার প্রতিটি কর্মীর বাড়ির খবরের খুঁটিনাটি পর্যন্ত তিনি জানেন। কোনও কর্মীর ছেলের অসুখ শুনলে তিনি তার বাড়িতে দেখতে যান, কারও মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ হলে তিনি পাত্র পক্ষের খোঁজ খবর নেন, দু'একবার বাধাও দিয়েছেন, আবার উপযুক্ত বিয়েতে তিনি সারাক্ষণ এমন ব্যস্ততা দেখিয়েছেন যেন তিনি কন্যা কর্তা।

তা বলে যে তিনি সমস্ত কর্মীর কাছ থেকে সমীহ বা শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তা নয়। ষাট, সত্তর ও আশির দশকের উগ্র রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সমস্ত কারখানার মালিকদেরই শোষন-পীড়ন বলে গণ্য করা হত, যখন তখন তাদের পায়ে কুঁড়ুল মারার চেষ্টাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রীতি, সেই কুড়ুলের আঘাতে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের পায়ের তলায় গাছের ডালটিও যে ভেঙে পড়ছে, তা তারা খেয়াল করেনি। ব্যক্তিগত মালিকানা নির্মূল করার জন্য যাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিল, তারা দেখেও দেখতে চায়নি সরকার অধিগৃহীত কলকারখানাগুলির পরিণতি, রুগ্ণ থেকে রুগ্ণতর হয়ে সেগুলি মৃত্যু দশায় ধুঁকছে।

সময়ের হাওয়ায় তখন পরমেশের অফিস-কারখানাতেও গোলমাল হয়েছে কয়েকবার, স্ট্রাইকও হয়েছে প্রায় অবুঝের মতন দাবিতে, তবে সেগুলি শ্রমিকদের দলবদ্ধতায় কিংবা অন্যান্য ইউনিয়ানের উস্কানিতে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রায় কেউই পরমেশকে অশ্রদ্ধা করেনি। মানুষটি যে আসলে নিঃসঙ্গ ও অসহায়, তা তারা অনুভব করেছে। একমাত্র অজিত সামন্ত নামে একজন নেতা গোছের কর্মী কিছুতেই পরমেশের কোনও গুণের কথা স্বীকার করেনি, তার কাছে মালিক মাত্রই শ্রেণীশত্রু। ব্যক্তি হিসেবে তাদের বিচার চলে না, কেউ যদি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি কিংবা ভালবাসার ভাব দেখায়, সেটাও আসলে দুরাত্মার ছল। এদের একেবারে ঝাড়ে মূলে নির্বংশ করা উচিত। অজিত অনেক সময় অফিসের মধ্যেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই সব কথা বলে, তার কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যরা তার কথা শুনে প্রতিবাদও করে না, সমর্থনও করে না। ক্রমশ সেও তার অফিসের মালিকের মতনই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে।

অজিতের এই সব চিৎকার পরমেশ কয়েকবার নিজের কানে শুনেছেন। একদিন অজিতকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, তুই

চন্দন এ অফিসের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মানিয়ে নিয়েছে

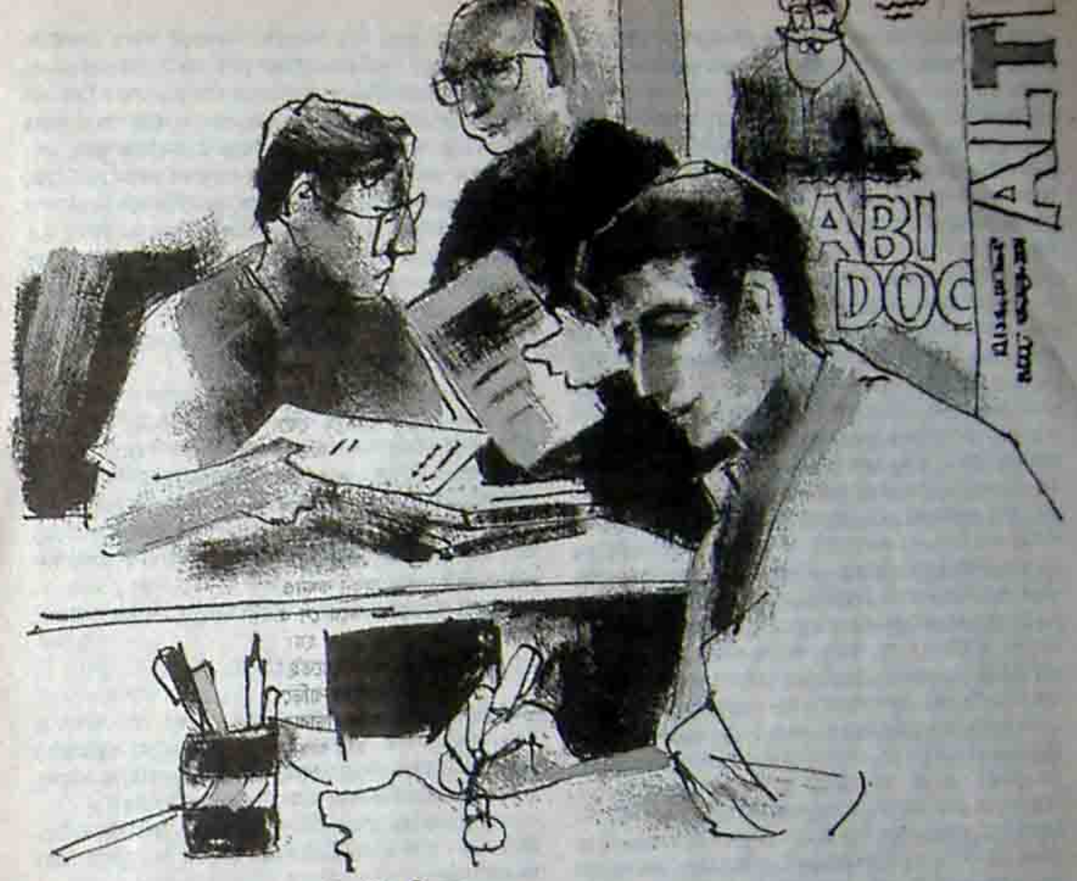

আমার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে চাস তো কর, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজের সময় ওই সব করবি না। কাজে ফাঁকি দিবি না, তা হলে তোর বাবাকে বলে দেব!

কোনও জঙ্গি শ্রমিক নেতাকে তার বাবার কাছে নালিশ জানাবার ভয় দেখানোর আর কোনও দৃষ্টান্ত আছে কি না কে জানে! আসলে অজিতের বাবা ছিলেন এই কম্পানির একেবারে শুরুর দিকের বিশ্বস্ত কর্মী, রিটায়ার করার পর তিনি তার ছেলেকে চাকরি দেবার জন্য পরমেশের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছিলেন, অনেক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

অফিসের হল ঘরটার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে পরমেশ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন চারপাশটা। এ সবই তাঁর নিজের হাতে গড়া। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে এ কম্পানির কি গতি হবে? মৃত্যু তো তাঁকে আর বেশিদিন রেয়াত করবে না। হঠাৎ তিনি খুবই ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করেন, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে আর চোখে জল এসে যায়।

চন্দন এ অফিসের সঙ্গে নিজেকে অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছে। তার একচোরা স্বভাব, অন্যদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলতে চায় না। কিন্তু অফিসে কাজ করতে গেলে একেবারে নির্বাক হয়ে থাকলেও তো চলে না। একই পরিবেশে যে মানুষ অন্যদের থেকে আলাদা হতে চায়, তাকে সবাই সন্দেহ করে। যদি কেউ বেশি বেশি সততা দেখাতে চায়, তাকে মনে করা হয় গভীর জলের মাছ।

এ অফিসে অবশ্য অসৎ হবার তেমন কোনও সুযোগ নেই। সরকারি অফিস নয় যে কেউ ঘুষ দিতে চাইবে, উপরি উপার্জনেরও কোনও পথ খোলা নেই। তাই রাগের চোটে কেউ কেউ অফিসের প্যাড, জেমস ক্লিপের বাক্স, স্টেপ্লার এই সব বাড়িতে নিয়ে যায়। আজকাল চতুর্দিকেই মাইনে ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার গল্প শোনা যায়, সুতরাং যারা তা পায় না, তারা ভেতরে ভেতরে গজরায়। কেউ কেউ সে জন্য অফিসের টেলিফোন বেশি ব্যবহার করে। পরমেশ যখন নিজের চেম্বারে থাকেন না, তখন সেখান থেকে তাঁর ফোনে দিল্লি-মুম্বই এস টি ডি করা যায়, কেউ কেউ সেইভাবে ঘুষের বদলা নেয়।

দু'তিন বছরের মধ্যে চন্দনের শান্ত স্বভাবটা সবাই মেনে নিয়েছে। সে মিটিং-মিছিলে যেতে চায় না। আবার মালিকের দালালও যে নয়, তাও জানা হয়ে গেছে। অন্যদের তুলনায় সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে পারে, সে জন্য অন্য কেউ কেউ নিজেদের কাজ তার ওপরে চাপিয়ে দেয়, তাতে চন্দন আপত্তিও করে না।

কর্মীদের মধ্যে কয়েকটি আলাদা আলাদা গোষ্ঠী আছে। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে মোট পাঁচজন, এরাও একটা গোষ্ঠী, প্রয়োজনে কোনও বেয়াড়া কর্মচারিকে টাইট দেবার ক্ষমতা এদের আছে। চন্দন লক্ষ করেছে, মানুষ যতগুলি ব্যাপারে আনন্দ পায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে অন্যকে কিছুটা অসুবিধেয় ফেলা। যে কাজটা আজই করে ফেলা যায় অনায়াসে, সে জন্যও বলা হয়, কাল আসবেন। যারা কাঁচা মাল সরবরাহ করে, তাদের বিল পেমেন্টের ব্যাপারে কিছুটা কমিশন দাবি করার কোনও উপায় নেই, স্বয়ং পরমেশ সেদিকে নজর রাখেন, বিলের ওপর তিনি টাকা চুকিয়ে দেবার তারিখ বসিয়ে দেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিটি সেই বিল উল্টেপাল্টে দেখে মনোযোগ দিয়ে, তারপর গম্ভীরভাবে বলে, আজ তো হচ্ছে না, কাল আসতে হবে, ফার্স্ট আওয়ারে চলে আসুন। একদিন দেরির জন্য কেউ মালিকের কাছে নালিশ জানায় না। পরদিন সেই ব্যক্তিটিকে আবার বাস-ট্রাম বা ট্যাক্সিতে আসতে হয়, তাতে কর্মচারিটির কোনও লাভ নেই, শুধু ওই বিড়ম্বনাটুকু জুড়ে দিতে পেরেই সুখ।

অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের পাঁচ জন কর্মী সবাই অবিবাহিত। প্রধান হিসাবরক্ষক সত্যেন গাঙ্গুলির বয়েস একান্ন, তাকে সবাই বলে কনফার্মড

ব্যাচেলর। একটা বয়েসে অনেক মানুষের যৌনবাসনা এসে ভর করে জিভে। এই সত্যেন গাঙ্গুলিও আদিরসাত্মক কথা ও খেউড় খুব পছন্দ করে।

হিসেব বিভাগের এই গোষ্ঠীটি প্রতিমাসে একবার অফিসের বাইরেও মিলিত হয়। মাইনের দিন এরা সরাসরি বাড়ি ফেরে না। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু টাকা ওড়ায়। বিবাহিত ব্যক্তিদের বোধহয় ওই দিনটিতে বাড়ি ফিরে টাকা পয়সার হিসেব দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, এরা তার থেকে মুক্ত। চন্দনকেও এই দিন যেতে হয় এদের সঙ্গে। গোষ্ঠীর নিয়ম ভঙ্গ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেকবারই অবশ্য সে মৃদু আপত্তি জানায়, যদিও তা টেঁকে না।

রেস্তোরাঁয় গিয়ে এরা প্রচুর খাদ্যের সঙ্গে মদ্যেরও অর্ডার দেয়। এরা কেউই নিয়মিত মদ্যপায়ী নয়, সে খরচ জোগাড় করার সামর্থ্যই নেই, শুধু মাসে একবার নিয়মভঙ্গ করে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সত্যেনই এদের নেতা; কে কী না কতটা খাবে, তা সে-ই ঠিক করে। সত্যেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চন্দনকে মদ ধরাতে পারেনি। প্রথমবার তাকে খুব জোরাজুরি করে এক পেগ হুইস্কিতে জল-সোডা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সত্যেন বলেছিল, খাও না ভাই, একটা চুমুক দিয়েই দেখো। তাতে জাত যাবে না। চন্দন বাধ্য ছেলের মতন তাতে একটা চুমুক দিয়ে দেখিয়েছিল যে তার জাত যাবার ভয় নেই, তারপর মুখ তুলে করুণভাবে বলেছিল, আমার ভাল লাগে না। এরপর তাকে দেওয়া হয়েছিল বিয়ার তাতেও সে মাত্র একটা চুমুকই দিয়েছে। বাকিটা ছোঁয়নি। এখন আর অন্যরা তাকে পেড়াপিড়ি করে না। কিন্তু তাকে সর্বক্ষণ বসে থাকতে হয়।

মদ্যপানের ইচ্ছেই চন্দনের মনে জাগে না, কয়েক পেগ খাবার পর অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখে। তাদের বাড়িতে ওসবের চল নেই। তবে মাতাল কি আর সে কখনও দেখেনি? রেল স্টেশনে, রাস্তায় মাঝে মাঝে চোখে পড়েই। কিন্তু একেবারে কাছে বসে কয়েক ঘন্টা ধরে মাতলামি দেখার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য রকম। এক একটা পেগ শেষ হয়, তাতে অন্য চারজনের চোখের রং ও কথা বলার ধরন বদলে যেতে থাকে। শুধু এই টেবিলে নয়, সব কটা টেবিলে। গলার আওয়াজ ক্রমশ চড়ে, কিছুক্ষণ পর কেউ আর অন্যের কথা শুনতে চায় না। শুধু নিজের কথা বলতে চায়। সত্যেনের মুখ দিয়ে ছোটে অশ্লীল শব্দের ফোয়ারা। প্রীতম নামের সহকর্মীটি প্রায় চন্দনেরই সমবয়সী, অফিসে তাকে বেশ ভদ্র মনে হয়। রোজ একটা না একটা গল্পের বই নিয়ে আসে, সে চার পেগ হুইস্কির পর আরও খাওয়ার জন্য জেদ ধরে। উঠতে চায় না। চিৎকার করে বলে, আমি শালা সব পয়সা ওড়াবো, তাতে কার বাপের কী?

মদ খেলেই চিৎকার করে কথা বলতে হয়, তাই চন্দন কখনও এ নেশা করবে না।

বিল মিটিয়ে দেবার পরও প্রীতম উঠতে চায় না, তাকে জোর করে টেনে বাইরে আনতে হয়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না প্রীতম, একটু একটু দোলে, হিরে গলায় বলে, আমি এখন বাড়ি যাব না! আমি অন্য জায়গায় যাব। সত্যেন তার ঘাড় ধরে ঠেলে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়, তখনও সে চাঁচাতে থাকে।

চন্দনের ভয় হয়, এই অবস্থায় প্রীতম বাড়ি চিনতে পারবে কী? ট্যাক্সিওয়ালা যদি ওকে কোনও বিপদে ফেলে? অন্যরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রীতম থাকে বেহালায়, সেদিকে আর তো কেউ যাবে না।

পরদিন প্রীতম অফিসে আসে না। প্রত্যেকবারই এ রকম হয়। সে রাতে সে কী করে বাড়ি ফিরেছিল কিংবা অন্য কোথাও গিয়েছিল কি না সে ব্যাপারে একেবারে চুপ। অন্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রীতমের ভাব-ভালোবাসা আছে কিন্তু সে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ তার বাড়িতে তিনটি অবিবাহিত বোন আছে, ওপরের এক দাদার বিয়ে করেনি। চন্দনের মনে হয়, এটা যেন একটা অঙ্ক, কিন্তু কোথায় যেন একটা কী ভুল আছে, তাই কিছুতেই উত্তর মিলবে না।

পুজোর বোনাস নিয়ে ইউনিয়ানের সঙ্গে পরমেশের দর কষাকষি শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগেই। হাওড়ায় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, এক একটা লেদ মেশিন নিয়ে বসে গিয়ে যারা এক সময় পশ্চিমবাংলাকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থানে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অনেক কারখানার শেডের কঙ্কালটা রয়ে গেছে। ভেতরে বাতি জ্বলে না বহুদিন। অনেক ঝড় ঝাপটার মধ্যেও কিন্তু পরমেশের কারখানাটি এখনও রক্তাল্পতায় কখনও ভোগেনি, কর্মীদের মাইনে আটকে যায়নি, বোনাসও দেওয়া হয়। তবে, পরমেশ ইউনিয়ানের নেতাদের সঙ্গে কুড়ি টাকা পাঁচিশ টাকা নিয়েও দারুণ দরাদরি করেন, এক এক সময় আলোচনা ভেঙে পড়ার মুখে যায়, দু' পক্ষেরই মেজাজ উত্তপ্ত হতে হতে ফুটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন একটা চুক্তি হয়ে যায়, তখন পরমেশ কেঠো হাসি হেসে ইউনিয়নের নেতা বলাইকে বলেন, ভাবলে খুব আমায় চাপ দিয়ে আদায় করে নিলে, তাই না? এখন আমার ওয়ার্কারদের মধ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? দেখাচ্ছি মজা! এরপর পরমেশ অফিস ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে দেন, চুক্তিতে যা ঠিক হয়েছে, তা আপনারা সবাই শুনেছেন? এতে বলাইয়ের কোনো কৃতিত্ব নেই। আমি আরও দুশো টাকা করে বেশি দেব বলে ঠিক করেই রেখেছিলাম। সবাই সেটা পাবেন, চুক্তির অতিরিক্ত!

এবছরও বোনাস বেশ ভালোই পাওয়া গেছে। দুপুর থেকেই সত্যেন আর প্রীতমের মধ্যে কী যেন গোপন আলোচনা চলছে ফিসফিসিয়ে। ছুটির পর অন্য সবাই চলে যাবার পরও অ্যাকাউন্টস বিভাগের পাঁচ জন রয়ে গেল কাজ মেটাতে। তখন সত্যেন অন্যদের বললো, মাইনের টাকা, বোনাসের টাকা, এতসব ক্যাশ আজ কেউ বাড়ি নিয়ে যেও না। অফিসের লকারে রেখে যাও, শুধু পাঁচ শো করে টাকা সঙ্গে রাখো। আজ আর পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় খাওয়া হবে না, আজ একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো।

চন্দনের কাঁধ চাপড়ে সত্যেন আবার বললো, সে এক মজার জায়গা!

আট

ট্যাক্সিটা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকে যাবার বদলে বেঁকল বাঁ দিকে। পোস্তা আর বড়বাজারের মধ্য দিয়ে গিয়ে একজায়গায় ড্রাইভারকে থামাতে বললো সত্যেন। তারপর সহকর্মীদের বললো, সবাই এখন একশো টাকা করে ছাড়ো, কিছু কেনাকাটি আছে।

কাছাকাছি দোকান থেকে দু'টি রামের বোতল, বাদাম টাদাম নিয়ে ফিরে এলো। তারপর ট্যাক্সিটা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে ছুটলো উত্তর কলকাতার দিকে।

এদিকে রাস্তায় একদিকে লোডশেডিং, অন্য দিকে আলো। চন্দন কলকাতার রাস্তা ভালো চেনে না, উত্তর কলকাতা আরও অপরিচিত। বেশ কিছুক্ষণ চলবার পর অন্ধকার দিকটাতেই সত্যেন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললো, এবার বাঁয়ে ঢোকো।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘাঁচ করে ব্রেক কষে বললো, আমি গলির মধ্যে যাবো না। মোড়ে নেবে যান।

প্রীতম এর মধ্যেই বোতল খুলে গলায় নিট রাম ঢালতে শুরু করেছে, সে তেড়ে উঠে বললো, কেন, ভেতরে যাবে না কেন?

ড্রাইভার শান্ত, দৃঢ় গলায় বললো, এসব পাড়ায় আমরা ঢুকি না।

এ সব পাড়া কথাটা চন্দনের কানে লাগলো।

সত্যেন আর তর্ক না বাড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, নেমে পড়, নেমে পড়, কাছেই।

অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটি দোকানে মোম কিংবা হ্যাজাক জ্বলছে। লোক চলাচল যথেষ্ট। ভালো দেখা না গেলেও কেউ কারুকে ধাক্কা মারে না। শহরের অন্য রাস্তার তুলনায় এখানে যেন আওয়াজ বেশ।

ওরা নেমে হাঁটতে শুরু করতেই একজন লোক পাশে এসে নিচু গলায় বললো, আমার সঙ্গে আসুন।

সত্যেন বললো, তার দরকার নেই। আমার চেনা আছে।

লোকটি তবু হাঁটতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে।

সত্যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে কয়েকটা গোড়ের মালা কিনলেন, ফুল-ওয়ালাকে সে দেখতে পেল কী করে কে জানে। এক একটা মালা অন্যদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, গলায় পরিসনি, হাতে জড়িয়ে নে।

একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। জেনারেটারের শব্দ।

সে রকম একটা বাড়ির সামনে সত্যেন থামতেই ছায়াসঙ্গীটি বললো, এখানে শুধু শুধু বেশি খর্চা করবেন কেন? আমি আরও ভালো

জায়গায়—

সত্যেন বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, আমরা এখানেই যাবো।

ছোট্ট লোহার গেট খোলা, তার এক পাশে একটা কাঠের চেয়ারের ওপর দু' পা তুলে বাবু হয়ে বসে আছে একজন মাঝ বয়েসী লোক, আবলুসের কালো মুখ, কিন্তু তার পুরুষ্টু গোঁফটি ধপধপে সাদা। সে এই দলটির প্রত্যেকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

খুব পরিচিত ভঙ্গিতে সত্যেন বললো, সিংজী, ভালো তো?

লোকটি সত্যেনকে চেনার কোনো ভাব না দেখিয়ে, বাঁ হাতের পাঞ্জা নেড়ে বললো, যাইয়ে, যাইয়ে!

ভেতরের প্যাসেজটা খুব সরু, কোনোক্রমে দু' জন মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে। উল্টোদিক থেকে কেউ এলে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়।

বাড়ির ভেতর থেকে এক সঙ্গে কয়েকজন মেয়ের হাসির আওয়াজ ভেসে এলো।

এদের দলের প্রশান্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললো, সত্যেনদা আমি যাবো না।

তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, দু' চোখে ভয়ের ছায়া।

সত্যেন বললো, কেন, কী হলো?

প্রশান্ত বললো, এটা সোনাগাছি? না, না, আমি যাবো না। আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ।

আরে ভয়ের কী আছে? কোনো ভয় নেই, দেখবি খুব মজা হবে।

আমি পারবো না, আমার ইয়ে, আমার খুব পায়খানা পেয়েছে!

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রশান্ত পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেল।

সত্যেন হা হা করে হেসে উঠে বললো, অ্যাই রে, হারামজাদাটা সাদা প্যান্ট পরে এসেছে, হলদে করে ফেলবে।

অঞ্জন নামে আর একজন ফিসফিস করে বললো, সত্যেনদা, পুলিশের ঝামেলা হবে না তো?

সত্যেনের বদলে প্রীতম বললো, ধ্যাতস পুলিশের কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? রাত এগারোটা পর্যন্ত যে-কেউ আসতে পারে।

চন্দনের কিন্তু একটুও ভয় করছে না। বরং তার কৌতূহলই প্রবল হয়ে উঠছে।

দরজার পরেই দু' দিকে দুটি বারান্দা। পাশাপাশি ঘরগুলোর দরজা খোলা, প্রত্যেক দরজায় সাজ গোজ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি করে রমণী, নানান বয়েসের, প্রত্যেকের খোঁপায় ফুল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুরুষ। তারা এ রমণীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছে। তাদের মধ্যে একজন নেমে এসে ঢুকে গেল একটি মেয়ের ঘরে।

সবচেয়ে কাছের দরজার মেয়েটি এই দলটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললো, কী গো, এসো—

সত্যেন তার সঙ্গীদের বললো, দোতলায় চল।

সেই মেয়েটি বললো, দোতলায় কি বেশি মধু?

সত্যেন উত্তর না দিয়ে সিঁড়িতে উঠলো।

দোতলাতেও একই রকম দু' দিকে বারান্দা। দু' একটি ঘরের দরজা বন্ধ, দু' একটি ঘরের দরজা খোলা, কিন্তু সেখানে কোনো রমণী নেই। তারা পাঁচ সাতজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যক্তিকে ঘিরে।

এই লোকটিও বসে আছে একটি চেয়ারে, প্রৌঢ়, কিন্তু দারোয়ান শ্রেণীর মনে হয় না। সুগঠিত, ফর্সা চেহারা, মুখে শিক্ষার ছাপ আছে। এর হাতে একটি রঙীন পানীয়ের গেলাশ। তার কোনো কথা শুনে রমণীরা দুলে দুলে হাসছিল, সত্যেনদের দলটিকে দেখে প্রৌঢ়টি হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, এই তো একগুচ্ছ নাগর এসেছে, যা, যা, তোরা কাছে যা।

সিঁড়িটা তিনতলাতেও উঠে গেছে। কয়েকজন লোক দুদ্দাড় করে নেমে এলো ওপর থেকে, একটি স্ত্রীলোক কী সব বলতে বলতে যেন তাড়া করছে তাদের।

সত্যেন ডান দিকের বারান্দা দিয়ে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে থামলো। দরজা খোলা, ভেতরে হিন্দি গান বাজছে। কারুকে দেখা যাচ্ছে না।

অন্য দুটি মেয়ে ওদের পাশে এসে, একজন বললো, শেফালির ঘরে বসবে? তোমরা তো চারজন, ভাগ ভাগ করে এসো—।

সত্যেন বললো, আমরা এক সঙ্গে বসে ড্রিংক করবো।

ঘরটার পেছন দিকে একটা পর্দা টাঙানো, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একজন রমণী, সে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, তার বেশ বড় সড় চেহারা, ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। তবে সেরকম হতে বেশি দেরি নেই মনে হয়, বয়েসও চল্লিশের কাছাকাছি।

দরজার কাছের একটি মেয়ে খানিকটা বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করলো, কী লো শেফালি, এক সঙ্গে চারজনকে বসাবি?

শেফালি অবহেলার সঙ্গে বললো, চারজন কেন, এক ডজনেও আপত্তি নেই।

সত্যেন আবার বললো, আমরা শুধু ড্রিংক করবো।

শেফালি বললো, এসো, এখন টাইম হলো কত? সাতটা দশ।

তারপর সে গলা চড়িয়ে ডাকলো, নকুড়, নকুড়!

প্রায় সমস্ত ঘরটা জুড়েই জাজিম পাতা। একটা দেয়াল আলমারি ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। ওরা জাজিমের ওপর বসতে না বসতেই দরজার কাছে চলে এলো একজন বেশ বলশালী পুরুষ।

শেফালি বললো, কি মদ আনবে, ওকে টাকা দাও।

সত্যেন বললো, মাল আমাদের সঙ্গেই আছে, আনাতে হবে না।

শেফালি বললো, মাল আগেই কিনে এনেছো? সেয়ানা পার্টি!

সত্যেন বললো, তোমাদের এখানে ডবলের বেশি দাম নেয়, তা কি আমি জানি না?

শেফালি বললো, তা হলে অন্য কিছু আনাও, নইলে নকুড় ভেগে যাবে। আমি মাংস ছাড়া মাল খেতে পারি না।

সত্যেন একটা একশো টাকার নোট বার করে দিয়ে বললো, তা হলে কষা মাংস নিয়ে এসো—।

নকুড় অবহেলার সঙ্গে বললো, মোটে একশো টাকা? কতটুকু মাংস হবে, এই এইটুকুনি ভাঁড়।

সত্যেন আরও একশো টাকা চেয়ে নিল প্রীতমের কাছ থেকে।

প্রীতম বলল, আমার কিন্তু সোডা লাগবে। এখানকার জল খাবো না।

নকুড় বলল, আরও একশো ছাড়ুন।

শেফালি আবার পর্দার আড়ালে চলে গিয়ে ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। লম্বা চুলে শুধু একটা আলগা গিঁট বেঁধেছে।

আলমারি থেকে গেলাশ বার করতে করতে সে জিজ্ঞেস করল, তোমরা বুঝি এক আপিসে কাজ করো সবাই?

সত্যেন বলল, কী করে বুঝলে আমরা চাকরি করি? ব্যবসাও তো করতে পারি।

শেফালি বলল, ও আমি মুখ দেখলেই বুঝি। যারা ব্যবসা করে, তারা প্রথমেই একটা পাঁচশো টাকার নোট ছাড়ে।

আলমারি থেকে একটা গোলাপফুল আঁকা ট্রে বার করে তার ওপর গোটা পাঁচেক গেলাশ সাজিয়ে নামিয়ে রেখে সে আবার জিজ্ঞেস করল, সোডা না আসা পর্যন্ত বসে থাকবে?

প্রীতম বলল, আমি নিট খাবো ততক্ষণ। তুমি ঢেলে দাও।

শেফালি বলল, আমি ঢালতে ফালতে জানি না। তোমরা নিজেরা নাও না।

প্রীতম বলল, এ আবার জানার কী আছে? না হয় একটু কম বেশি হবে। তবু একজন মেয়েমানুষ ঢেলে দিলে ভাল লাগে। বারে ফারে তো শুধু কেঠো কেঠো চেহারার বেয়ারারা দেয়—

শেফালি বলল, মেয়েমানুষ মদ ঢেলে দিলে সাকি সাকি মনে হয়, তাই না?

প্রীতম বলল, তুমি সাকি কাকে বলে জানো?

শেফালি বলল, জানব না কেন? তোমাদের থেকেই শুনে শুনে শিখি। সিনেমাতেও দেখেছি। সেই একটা গান আছে না, একটু শরাব দাও সাকি।

প্রীতম বলল, সাকি অবশ্য মেয়েমানুষ নয়, অল্প বয়েসি ছেলে। ওমর খৈয়ামের আমলে কি মেয়েমানুষরা পর্দা ছেড়ে বেরুতো?

সত্যেন বলল, নে শালা, আর জ্ঞান দিসনি! চুমুক দে। চিয়ার্স।

শেফালি চন্দনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ও খাবে না?

সত্যেন বলল, তুমি চেষ্টা করে দেখোই না, যদি খাওয়াতে পারো। ও মাল খায় না, সিগ্রেট খায় না, মেয়েমানুষও বোধহয় কখনো ছুঁয়ে

দেখেনি। কী গো চন্দন, তুমি কি এখনো ছেলে-কুমারী নাকি গো?

চন্দন এসব কথার উত্তর দেয় না। তবে মুখে সে সামান্য হাসি মাখিয়ে রাখে।

শেফালি বলল, ভালই তো। এমন আর এদাস্তি দেখাই যায় না।

সত্যেন বলল, সবাই এরকম ভাল ছেলে হলে তোমাদের কারবার চলবে কী করে?

শেফালি বলল, না চলে না চলবে। তা বলে ভাল লোকগুলো নষ্ট হোক, এ আমি মোটেই চাই না। তোমরা ওকে জোর করে ধরে নিয়েশো বুঝি?

সত্যেন বলল, না, মোটেই জোর করে ধরে আনিনি। কী রে চন্দন, তোকে জোর করে এনেছি?

চন্দন এবার শব্দ না করে দু'দিকে মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি নীচের দিকে। জোর করার ব্যাপার থাকলে সে তো প্রশান্তর মতন পালাতে পারতো।

প্রীতম বলল, তোমাদের কাছে আসা মানে কি নষ্ট হয়ে যাওয়া? কেন, অন্য মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কী?

শেফালি এবার কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল। হি হিঃ, হি হি হি, অনেকটা আপন মনে হাসির মতন। হাসতে হাসতে বলল, এসব কথার কোনো মা-বাপ নেই।

নকুড় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেটা ঠেলে ঢুকলো দুটি মেয়ে। এক জনের হাতে একটি খালি গেলাশ।

সেই মেয়েটি বলল, ভাইদাদার জন্য একটু মাল দেবে? বেচারির বোতল ঢলঢল করছে।

শেফালি বলল, এনাদের জিজ্ঞেস কর।

সত্যেন বলল, হ্যাঁ। নাও না। অনেক আছে। ভাইদাদা কে? অদ্ভুত নাম তো!

বোতল থেকে গেলাশে অনেকখানি রাম ঢালতে ঢালতে মেয়েটি বলল, ঐ যে যাকে দেখলেন, বাইরের চেয়ারে বসে আছে। আমরা বলি ভাইদাদা কেন বলি রে?

অন্য মেয়েটি বলল, কে জানে! ও তে নিজে বলে, ওর নাম মুসাফির।

শেফালি বলল, আমাদের বাঁধা বাবু। ফতো কাপ্তেন।

অন্য মেয়েটি বলল, আজ কী দিন পড়েছে, কাস্টোমারদের দেখা নেই, মাছি উড়ছে!

সত্যেন বলল, তোমরাও এখানে এসে বসো না। এক সঙ্গে গল্প করা যাবে।

সে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো শেফালিদি, আমরা আসব? গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ!

শেফালি বলল, আয়, যদি এনাদের মর্জি হয়। তবে, নিজেদের গেলাশ নিয়ে আয়।

অন্য মেয়েটি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, আহা-হা, আমাদের নিজের গেলাশ আনতে হবে কেন? তোমার ঘরে এত গেলাশ রয়েছে! আমরা কি মেথর না মুদ্দোফরাস?

শেফালি এবারেও হেসে ফেলে বলল, সব আমাকে ধুতে হবে। তোরা তাহলে সব গেলাশ ধুয়ে দিয়ে যাবি।

মেয়ে দুটি বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, সঙ্গে আরও একজন। পুরুষরা চারজন বলেই বোধহয় এরাও চারজন হতে চায়।

সহজভাবে শেফালি ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। চাঁপা, রাধা, আর চামেলি।

সত্যেন বলল, তোমাদের চারজনেরই ফুলের নামে নাম? তার মানে, কোনোটাই আসল নাম নয়।

শেফালি বলল, আসল-নকল জানি না। তোমরা তো নিজেদের নাম বলতেই চাও না। আমরা জিজ্ঞেসও করি না।

প্রীতম বলল, আমাদেরও নাম বলতে কোনো আপত্তি নেই। আমি প্রীতম, ইনি সত্যেনদা, পাশে অঞ্জন আর চন্দন।

রাধা বলল, আমার নাম তো ফুলের নাম নয়।

সত্যেন বলল। হ্যাঁ, রাধাচূড়া ফুল হয়, কৃষ্ণচূড়ার পাশে থাকে।

রাধা বলল, জানতাম না তো। কত কিছুই জানি না।

চন্দন দেখল, রাধার ভ্রূ-সন্ধির কাছ থেকে কপালের শেষে, চুল পর্যন্ত একটা সরু, লম্বা দাগ। খুব স্পষ্ট নয়, মুখে খুব পাউডার মেখেছে রাধা, তাই দেখতে পাওয়ার কথাও নয়, কিন্তু এক একবার মুখ ফেরাতে সোজাসুজি আলো পড়লে বোঝা যায়।

হয়তো অন্য কেউ দেখছে না, শুধু চন্দনই লক্ষ করেছে।

মেয়েরা বসেছে জাজিমের এক প্রান্তে, ছেলেরা দরজার দিকে। সকলের গেলাশে রাম ঢালার পর চিয়ার্স করে প্রীতম বলল, তোমরা সব দূরে দূরে বসে রইলে কেন? আজকাল বড় বড় ক্লাবের বড়লোকের বউরাও অন্য পুরুষদের একেবারে ঘা ঘেঁষে বসে। একজন কেউ আমার কাছে এসে বসো।

চামেলি বলল, তুমি কাকে চাইছো?

প্রতীম চাঁপার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তুমি আমার পাশে এসো।

সত্যেন নিজের পাশের জাজিম চাপড়ে বলল, শেফালি আমার কাছে থাকবে।

অঞ্জন প্রথম থেকেই নার্ভাস হয়েছিল, সেই জন্য সে বেশি বেশি মদ খাচ্ছে। তার গেলাশ খালি হয়ে যাচ্ছে সবার আগে।

সত্যেন বলল, অ্যাই অঞ্জন, সামালকে, সামালকে, আউট হয়ে গেলে কিন্তু তোকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাব। তাহলে তোকে হোল নাইটের চার্জ দিতে হবে।

নকুড় মাংস আর সোডা নিয়ে এলো। মাংসের ভাঁড়টা এমন কিছু বড় নয়, সোডার বোতল মাত্র দুটি।

সে জিজ্ঞেস করল, আর কী লাগবে?

সত্যেন বলল, আর কিছু না। কত টাকা ফিরলো?

প্রীতম তার কাঁধ চাপড়ে বলল, আরে সত্যেনদা, তুমি মাক্ষিচুষ হয়ে গেলে নাকি? এখানে টাকা ফেরৎ চাইতে নেই। ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, তুম যাও!

হঠাৎ আলো নিভে গেল।

শেফালি বলল, অনেকক্ষণ জেনারেটর চলেছে, এখন কিছুক্ষণ বন্ধ রাখবে।

সত্যেন বলল, তাতে আর কী হয়েছে। আমি বোতল ধরে রাখছি। দেখো, কারুর যেন গেলাশ উল্টে না যায়।

প্রীতম সিগারেট ধরাবার জন্য লাইটার জ্বালনো। সেই আলোর শিখায় তার মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে এসেছে, মনে হল, তার এরকমই হয়, যতই নেশা বাড়ে, সে বদলে যায়। অন্য সময়ের ভদ্র, সভ্য, নানা বিষয়ে পড়ুয়া প্রীতম ক্রমশ উগ্র আর রুঢ়ভাষী হয়ে ওঠে, নিজের বাড়ি বিষয়ে নিষ্ঠুর মন্তব্য করতে শুরু করে। নিজের অবিবাহিতা বোনেদের কথা, বিধবা মায়ের স্বার্থপরতার কথা, তার অকর্মণ্য দাদার কথা।

আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাখাও বন্ধ হয়ে গেছে, গরম লাগতে শুরু করেছে। এসব বাড়িতে কোনো জানলা খোলা থাকে না। বাইরে কে যেন গম্ভীর গলায় গান গেয়ে উঠল, আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা—।

অন্ধকারে চন্দনের কোনো অসুবিধে নেই, গরম বোধও করে না, সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রাধা নামে মেয়েটির কপালে লম্বালম্বি সরু, কাটা দাগ।

মিনিট পাঁচেক পরেই আলো জ্বলে উঠল।

শেফালি স্বস্তির সঙ্গে বলল, যাক, এবার মনে হচ্ছে আসল কারেন্ট এসেছে।

চামেলি বলল, নাও হতে পারে, এক সঙ্গে গোটা কতক কাস্টোমার এলে ওরা আবার জেনারেটার চালিয়ে দেয়।

শেফালি বলল, এল্চে কি না, বেরিয়ে দেখবি নাকি?

চামেলি বলল, তেমন হলে মুসাফির আমাদের ডাকবে।

প্রীতম চাঁপাকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়েছে। সে জোর দিয়ে বলল, না, না, তোমরা কেউ যাবে না। তোমাদের চারজনকেই আমরা বুক করেছি। মালকড়িও ঠিক পাবে।

রাধা যতবার চন্দনের দিকে তাকাচ্ছে, ততবারই চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। চন্দন অন্য কোনোদিকে দৃষ্টি সরাবে না। রাধা তো চন্দনের স্বভাব জানে না, তাই ক্রমশ কৌতূহলী হচ্ছে।

এক সময় সে জিজ্ঞেস করল, এই বাবুটির কী হল? কিছু খাচ্ছে না, কথা বলছে না।

প্রীতম বলল, এই বাবুটি এরকমই। শালগ্রাম শিলা। নট নড়ন চড়ন। একটা কাজ করলে হয় না?

সে সত্যেনের দিকে একটা চোখের ইঙ্গিত করল। সত্যেন সায় দিল দু'বার মাথা নেড়ে।

তারপর রাধার দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলল তার কানে কানে।

রাধা উঠে দাঁড়িয়ে চন্দনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এসো—।

চন্দন মুখ তুলে বলল, কোথায়?

রাধা বলল, এসো না আমার সঙ্গে। কথা আছে।

চন্দনও উঠে দাঁড়িয়ে রাধার সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মুসাফির নামের লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এখনো কয়েকটি মেয়ে। মুসাফির গান গাইছে।

বারান্দার একেবারে কোণের ঘরটিতে চন্দনকে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল রাধা। তারপর চোখের নিমেষে সে খুলে ফেলল তার শাড়িটা। যেন শায়া ও ব্লাউজ তার আসল পোশাক, শাড়িটা ওপরে জড়ানো ছিল মাত্র।

রাধার গড়নটা ছিপছিপে। চওড়া কপাল। নাকটা তেমন খাড়া নয়, তবে চোখ দুটিতে ভাষা আছে। ভুঁড়ি হয়নি, সামান্য খাঁজ আছে কোমরে।

শেফালির ঘরের তুলনায় এ ঘরখানা বড় মনে হয়, অবশ্য এ ঘরের এক পাশে পর্দা টাঙানো নেই। শেফালির দেওয়ালগুলি ছিল ফাঁকা, এ ঘরের দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি। ক্যালেন্ডারের পাতা ও ফিল্মের পোস্টার। একটি মদের বিজ্ঞাপনে প্রায় উলঙ্গ মেমসাহেব। নায়িকা মাধুরী দীক্ষিতের পাশে দুর্গা। লক্ষ্মী ঠাকরুণও আছে একজন পুরুষ অভিনেতার পাশে, তাকে চন্দন ঠিক চিনতে পারল না।

জাজিমের বদলে এ ঘরে একটি চওড়া খাটে বিছানা পাতা। আলমারি আছে কিন্তু চেয়ার বা টুল জাতীয় কিছু নেই। অপরিচিত কারুর বাড়িতে গিয়ে পুরুষরা সাধারণত বিছানায় বসে না বলে চন্দন দাঁড়িয়ে রইলো।

রাধা বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। বালিশে হেলান দাও।

চন্দন সন্তর্পণে এক পাশে বসলো, বালিশ ছুঁলো না।

কোথাও প্রথম এসে কয়েক পলকে সব কিছু একবার দেখে নেওয়া চন্দনের অভ্যেস। দেওয়ালের ছবিগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দুর্গার ছবিতে তার দৃষ্টি আটকে গেল।

ছবির শিল্পীটি অত্যন্ত কাঁচা, একটা মারাত্মক ভুল আছে। সিংহের পিঠে বসে আছেন শাড়ি পরা দশপ্রহরনধারিণী দেবী দুর্গা। দু'দিকে পা ঝুলিয়ে। শাড়ি পরে এরকম দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসা সম্ভবই নয়, যে-জন্য মেয়েদের সাইকেলের সামনের রডটা বেঁকে নিচু হয়ে থাকে। সিংহের পিঠ সেভাবে বাঁকানোর প্রশ্নই ওঠে না।

রাধা তার পাশে বসে পড়ে বলল, তুমি নাকি নতুন, আজই প্রথম, কিছু জানো না? তোমাকে আমার হাতে খড়ি দিতে হবে। নাকি, তুমি আগেও এয়েছো, মিচকে শয়তান সেজে থাকো?

চন্দন এ সব প্রশ্নের উত্তর জানে না, তাই শুধু হাসল।

রাধা একটা ছোট্ট হাই চাপা দিয়ে বলল, সে দেখা যাবে খন। মুখ চোরা লোকেরা ভালে যুদ্ধ জানে। শোনো একটা কথা বলি, আমি কিন্তু টাকাটা আগাম নিই। দুশো।

সে হাত বাড়িয়ে রইল চন্দনের সামনে। চন্দন এ পকেট সে পকেট খুঁজে দুশো টাকা বার করে দিল।

টাকাগুলো পাকিয়ে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে রাধা আবার জিজ্ঞেস করলো, ক্যাপ এনেছো?

ক্যাপ শব্দটি এখানে কী অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তা চন্দনের জানা নেই। সে বলল, ক্যাপ?

রাধা বলল, আমি বাবু ক্যাপ ছাড়া লোক বসাই না। আমাদের সমিতির মানা আছে। কার কী রোগ আছে কে জানে। আমার রোগ ফোগ কিছু নেই, রেগুলার চেক করি, তাও সাবধানের মার নেই। আমার কাছে ক্যাপও স্টক আছে, দশ টাকা লাগবে তার জন্য। দাও।

চন্দন দশ টাকার নোট দিল তার হাতে।

রাধা আলমারি খুলে টাকাগুলো রেখে একটা ছোট প্যাকেট বার করে এনে দিল।

চন্দন সেটা উল্টেপাল্টে দেখে এমন ভাবে পাশে রেখে দিল যে তাতেই বোঝা গেল, ওটার প্রয়োজন নেই তার কাছে।

রাধা বলল, যা গরম আজকে, জামাটা খুলে ফেল না!

না দরকার নেই। আমার গরম লাগছে না।

তুমি তো মাল টাল খাওনা দেখলুম। পানি খাবে? জল খাবে?

না।

তাহলে আর কী করবে? ভোদাই কার্ত্তিকের মতো বসে থাকবে? টাইম কিন্তু এক ঘন্টা। মনে করো, তুমি টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে গেলে, সিনেমা শেষ হয়ে যাবার পরও কি তোমায় বসে থাকতে দেবে? সব কিছুরই টাইম আছে।

একটু ভেবে, একটা নতুন কথা বলার ভঙ্গিতে সে বলল, হ্যাঁ, তবে তুমি যদি দু'বার টিকিট কাটো, তাহলে পারবে। আবার দু'শো।

চন্দন সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

আমি? শুনলে তো, আমার নাম রাধা। রাধাচুড়ো ফুল নয় গো, আমি রাধারাণী, রাধারাণী বিশ্বেস। আমি মোটে দেড় বছর এখেনে এসেছি, নতুনই বলতে পারো। তুমি আমার লায়েফ এস্টোরি শুনতে চাও?

লায়েফ এস্টোরি?

হ্যাঁ, যারা নতুন আসে, অনেকেই তো শুনতে চায়। কেউ কেউ আবার পকেট থেকে ছোট খাতা বার করে লিখে নেয়।

ও, লাইফ স্টোরি?

হ্যাঁ, শুনবে? আমাদের বাড়ি ছিল কাটোয়ায়। কাটোয়া চেনো তো? আমি বামুন ঘরের মেয়ে, নাইন কেলাস পর্যন্ত পড়িছি। আমার বাবার রোজগারপাতি ভালই ছিল, কোনোদিন ভাত-কাপড়ের অভাব হয়নি। নেহাৎ অদৃষ্টের দোষ, নইলে পাল্টি ঘরে বিয়ে শাদী করে আমার ভালই ঘর-সংসার হতে পারত। কিন্তু সবই কপাল! বড় রাস্তায় পেট্রোল পাম্প, সেই বাবুদের ছেলের নাম রাজেন, একেবারে রাজপুত্তুরের মতন চেহারা। তার নজর পড়ল আমার ওপর। আমিও তার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারি না। বয়েসের তুলনায় আমার চেহারাটা ছিল বড় সড়ো, এই দুটোও বড় বড়, আমার বিয়ের সম্বন্ধ দেখা চলছে, ঠিক পাত্র পছন্দ হচ্ছে না। মন মেজাজ খারাপ, এসময় রাজেন চোখ মারল। আমারও এমন বুদ্ধি আমি মরতে গেলুম ওর সাথে। সব চুপি চুপি হচ্ছিল, কেউ টের পায়নি, কিন্তু, কিন্তু, সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানো, আমার যখন বিয়ে ঠিক হল, খুব ভাল পাত্র, সিউড়িতে হোটেল চালায়, বাড়ির সবাই খুব খুশি, সেই সময়ই আমি টের পেলুম, আমার পেটে কাঁটা এসেছে! ব্যাস, এখন উপায়? এ অবস্থায় গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া মেয়েমানুষের আর কি উপায় থাকতে পারে? তোমার কাছে সিগ্রেট আছে? ও, তুমি তো খাও না!

বালিশের তলা থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে সে বলল, এ লাইনে আসবার আগে আমিও কি ছাই সিগ্রেট খেতে জানতুম? এখানে মদ, মাংস, সিগ্রেট সবই খেতে হয়। কেউ কেউ ইঞ্জেকশানও নেয়।

সিগারেট ধরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আরও শুনতে চাও?

চন্দন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

রাধা আলমারি খুলে একটা বোতল বার করল, তাতে সামান্য একটু রাম রয়েছে। সেটুকু গেলাশে ঢেলে বলল, না খেয়ে পারি না। নেশা লেগে গেছে। তুমি খাও না কেন? বসো না, এত চুপ মেরে থাক কেন?

চন্দন বলল, খেয়ে দেখেছি। ভাল লাগেনি।

রাধা বলল, খুব জোর বেঁচে গেছ। এ অতি হারামির নেশা। ধরলে আর ছাড়ে না। আমায় কে জোর করে প্রথমটায় খাইয়েছিল জানো? রাজেন নয়, সে নিজে খেত, একদিন গেলাশ তুলে বলেছিল, একটা চুমুক দিবি? আমি তখন বামুনবাড়ির মেয়ে, ওসব ছুঁতে পারি? ঘেন্না, ঘেন্না! আরও পরে, যখন রেলের সেই বাবু... ওঃ হো, পরের কথা আগে বলে ফেলছি। আমার বিয়ের যখন ঠিক ঠাক, এদিকে পেটে একজন এসে গেছে, তখন তো মরতেই হবে, সবচেয়ে বড় কথা বাপ-মা'র মান বাঁচাতে হবে, রেল লাইনে গলা দেব না গায়ে আগুন লাগাব এই সব ভাবছি, তখনো কিন্তু রাজেনের কাছে যাই, শরীরের টান বড় টান, আর কক্ষনো যাব না ভাবি, তবু ছুটে যাই। একদিন হঠাৎ রাজেনকে পেট হওয়ার কথাটা বলে ফেললুম, তা শুনে বলে কী জানো? তোর চিন্তার

কী আছে। আমি তোকে শাদী করবো। আমি জাত-ফাত মানি না। রাজেনরা তো পাঞ্জাবি। ওর বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে এদেশে আছে। বাংলা ঠিক-ঠাক বলে কিন্তু বিয়ে করে বউ আনে পাঞ্জাব থেকে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করলেও তো ওখানে থাকা যাবে না, মানে, আমার বাপ-মাও এ বিয়েতে রাজি হবে না তো! ওরকম আর একটা পেট্রোল পাম্প আছে দমদমে, আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে, বিয়ে হবে সেখানে। একদিন বাড়ি থেকে আর কিছু না নিয়ে, শুধু একটা কাপড়ের পুঁটুলি, চুপি চুপি পালিয়ে এসে চেপে বসলুম ট্রেনে। রাজেন আমায় খুব যত্ন করেছিল, কত রকম খাবার দাবার এনে দিল, দু'বার চা খাওয়ালো। আমার এমন পোড়া কপাল, ঠাণ্ডা হাওয়াতে ঘুম এসে গেল। কী জানি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল নাকি! ট্রেন যখন হাওড়ায় পৌঁছলো, তখন সব ভোঁ ভাঁ। কোথায় রাজেন। সব লোক নেমে গেছে, তবু আমি ঘুমিয়েই আছি। দু'জন কুলি এসে ঠেলাঠেলি করতে আমি চোখ মেললুম বটে, তবু ঘুম ছাড়তে চায় না। ঐ কুলি ব্যাটারাই আমাকে শেষ করে দিত বোধহয়, হটাৎ এসে পড়ল একটা সেপাই। রাত্তির তখন অনেক, সেপাইটা আমাকে কী সব জিজ্ঞেস করছে, আমি ঠিক উত্তর দিতে পারছি না, ঘুমও তো মালের নেশার মতন। সেপাইটা আমায় কোথায় নিয়ে গেল জানি না, একটা অন্ধকার ঘর, সেখানে পরপর দু'জন চাপলো আমার ওপর। মুখ বেঁধে দিয়েছিল, চ্যাঁচাতে পারিনি, তখন ঘুম টুম সব সাফ হয়ে গেছে, ওরই মধ্যে একজন খুব মারতে লাগল আমাকে।

কেন, মারলো কেন?

ওমা, কেন আবার? মানুষ তো এমনি এমনি মারে। যখন তখন মারে, মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালেই মার খেতে হয়।

আবার বাধা পড়ল, বন্ধ দরজায় শব্দ হল দুম দুম।

রাধা উঠে গিয়ে দরজা খুলে একটুক্ষণ কথা বলল একজনের সঙ্গে। তারপর আলমারি থেকে কিছু টাকা লোকটিকে দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা।

ফিরে এসে রাধা বলল, ও আমার নোকর। তুমি তো মাল ফাল কিছু খাবে না। ওসব কিছু না আনালে নোকররা রেগে যায়। ওদের কমিশন পায় না। এই নোকরটাও আমাকে আগে খুব মারতো এখন আর মারতে পারে না। আমাদের সমিতি হয়ে গেছে তো, এখন আর অত গা জুয়ারি চলে না। হ্যাঁ, কী বলছিলুম, ঐ ভোর ভোর রাতেই সেপাই দুটো আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল রামরাজাতলার এক বস্তিতে। সেখানে একজন বাবু থাকে, সেটা দিন-রাত মদ খায়, কী কাজ করে জানি না, যেমন মাতাল তেমনি রাগী, যা হুকুম করবে, তার একটু এদিক ওদিক হলেই মারবে। সেই শুয়োরের বাচ্চাটাই তো আমাকে জোর করে মদ গিলিয়েছে। কথায় কথায় হাত-পা বেঁধে রাখতো। বাইরে বেরুবার সময় দরজায় তালা দিয়ে যেত। তখনো কি আমি ইচ্ছে করলে মরতে পারতুম না, পারতুম। আগুন তো ছিলই, আগুন সব জায়গাতেই থাকে। কিন্তু বলো তো, বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে কোনটা ভাল?

গেলাশটা খাটের নিচে নামিয়ে রেখে রাধা বলল, আমাদের ভাইদাদা সব সময় বলে মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। মরবি কেন? কেউ যখন খুব কষ্ট পায়, কাঁদে, ভাইদাদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, কষ্ট পাচ্ছিস, কষ্ট সহ্য কর, দু'দিন কষ্টের পর পরশু হয়তো একটু শান্তি পাবি, কিন্তু মরে গেলে তো সবই ফক্কা! এই ভাইদাদাই তো আমাকে বাঁচাল। হ্যাঁ, রামরাজাতলার বস্তিতে ঐ মাতালটার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন পালিয়ে ছিলুম। কিন্তু যাবো কোথায়? বামুনবাড়ির মেয়ে, একবার বাড়ি থেকে বেরুলে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না। আর কোথাও কারুকে চিনি না। পয়সা কড়িও নেই, সব সময় খিদে পায়। পেটের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত ভিক্ষে করতে শুরু করলুম কলকাতার রাস্তায়। তোমরা কি জানো, এখেনে ভিক্ষে করাও সহজ নয়? সব ভিখিরিদেরও নিজেদের রাজত্ব আছে। সেই রাজত্বের মধ্যে নতুন কেউ এসে ভাগ বসাতে চাইলেই ওরা মেরে তাড়ায়। ভিখিরিদের কাছেও আমি মার খেয়েছি, মেয়ে-মদ্দা সবাই মেরেছে। তবু রাস্তা বদলে বদলে... একদিন সন্ধের সময় ভিখিরিরা আমায় মেরে তাড়াচ্ছে, তখন হঠাৎ কোথা থেকে ভাইদাদা এসে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার হাত ধরলো। আহা, কী সুন্দর সেই হাত, শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল গো। ভাইদাদা বলল, ভিক্ষে করতে নেমেছিস কেন? তোর শরীর তো এখনো শক্তপোক্ত আছে, রস আছে, শরীর বেচে খা। সেটা হবে নিজের রোজগার। ভিক্ষের চেয়ে ভালো না? চল, আমার সঙ্গে যাবি? সেই এসে উঠলুম এখেনে। ঘর ভাড়া দেবার তো রেস্ত ছিল না, তাই মাসিকে রোজগারের হাফ দিতে হয়। ভাইদাদাই তো বাঁচিয়েছে, নিজের রোজগারে খাই পরি, সিনেমা দেখতে যাই, কারুর কাছে ভিক্ষে মাঙতে হয় না। এই হলো আমার গল্প।

ওমা, এক ঘন্টা যে প্রায় হয়ে এল। তুমি আর কী করবে?

চন্দন বলল, আমি চলে যাব।

রাধা বলল, তুমি আমাকে একবার ছোঁবেও না বুঝি? তোমার বন্ধুরা বলছিল, কিন্তু জোরজারি করতে আমার কি দায় পড়েছে। ছোঁবে না তো ছোঁবে না। ফুরিয়ে গেল মামলা! আমাদের ঘেন্না করো বুঝি? তবে এলে কেন? বলো, ঘেন্না করো?

চন্দন দু'দিকে মাথা নাড়ল।

রাধা এবার ঝুঁকে পড়ে চন্দনের বুকের জামার একটা বোতাম খুলে ভেতরে হাত রেখে বলল, এই দ্যাখো, আমি তোমায় ছুঁয়ে দিলুম! জাত গেল তো! আহা, তোমার বুকে বুঝি খুব ব্যথা? কেউ দাগা দিয়েছে?

চন্দন একটু সরে এসে বললো, তোমার কপালের দাগটা কী করে হলো?

রাধা একটু চমকে গিয়ে বললো, কপালে? কই, ও তুমি দেখতে পেয়েছো. ওটা এখনকার নয়, অনেক দিনের। এমন মেরে দিল।

কে?

দেবদাস গো, দেবদাস। সিনেমায় দেখোনি, ছিপ দিয়ে মেরেছিল পারুকে। হি হি হি, না গো, মিছে কথা বলছি, আমার তখন কেউ ছিল না। ঐ তো একমাত্তর রাজেন, তার তো রস কষ ছিল না মোটেও, মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, সোহাগ সোহাগের কথা বলতে জানতো না, ধর তক্তা মার পেরেক কাকে বলে জান তো। ও ছিল সেই—

সে মেরেছিল?

শুনতে চাও? কেন? শুনে তোমার কী হবে? যদি সত্যি সত্যি কোপটা লাগতো, হি হি হি হি। তাহলে আজ আমায় এখান দেখতেই পেতে না, এই রাধা বলে কেউ থাকতোই না,হি হি হি হি, কী মজার ব্যাপার তাই না, অথচ আমি বেঁচে আছি। তখন আমার মোটে এগারো বছর বয়েস, আমরা তো অনেকগুলো বোন, একটা ভাই হয়েও বাঁচেনি, বাবা আমাদের মোটেই দেখতে পারতো না, সব সময় থাপ্পড় লাথি মারতো, একদিন আমি একটা সিকি চুরি করেছিলাম, হ্যাঁ, সত্যি মাইরি বলছি, চুরি করেছিলুম, হি হি হি, একটা লাল ফিতে কিনতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বাবা একটা হাসুয়া তুলে মারতে এলো, গলাটা কেটেই ফেলতো, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাবা আমাকে খুন করতে আসছে, হি হি হি, মা পেছন থেকে জাপ্টে না ধরলে...

চন্দনের সমস্ত রোমকূপে শিহরন শুরু হয়ে গেছে, তার দৃষ্টিতে ভর করেছে তার আত্মা।

আবার দরজায় দুম দুম শব্দ। এবার বেশ জোরে।

রাধা গিয়ে দরজা খুললো, এমনভাবে কথা শুরু করলো, যাতে বোঝা যায়, তার নোকর নয়, অন্য কেউ।

দরজা খোলা রেখেই ফিরে এসে রাধা বললো, এবার তুমি যাও। টাইম হয়ে গেছে। আমার অন্য লোক এসেছে।

চন্দন এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাধার মুখের দিকে।

রাধা বললো, কী হলো, এবার যেতে হবে গো। বাইরে লোক ডাঁড়িয়ে আছে।

চন্দনের দৃষ্টিতে রাধার মুখখানা যেন কাঁপছে। যেন আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে জলের নিচে।

দুজন লোক ঢুকে এলো ঘরের মধ্যে। একজনের মুখে চুরুট, চোখে কালো চশমা আর প্যান্ট-কোট পরা। অন্যজন পাজামা পাঞ্জাবি, দাড়ি আছে, কিন্তু গোঁফ নেই, মাথার চুল একেবারে কদম ছাঁট।

চুরুট-মুখো লোকটি চন্দনকে গ্রাহ্য করলো না, তাকিয়ে রইলো অন্য দিকে। দ্বিতীয় লোকটি প্রখর চোখে চন্দনকে দেখতে লাগলো।

রাধা প্রায় চন্দনের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে বললো, ঘর খালি করে দাও না।

বাইরে বেরিয়ে বারান্দা পার হতে হতে চন্দন দেখলো, শেফালির ঘরের দরজা বন্ধ। চন্দন কারুর খোঁজ করলো না, ঘোর লাগা মানুষের

মতন সে হাঁটতে লাগলো রাস্তা দিয়ে, উদ্দেশ্যহীনভাবে।

নয়

মাসের গোড়ায় বেশি কাজ থাকে। সাড়ে ছ'টা সাতটার আগে বেরোনো যায় না। শেষ কর্মচারিটি বের হবার আগে পরমেশ নিজেও যান না, তাঁর তো বাড়ির টান নেই, আর কোনই আকর্ষণ নেই, সম্ভব হলে তিনি অফিসেই রাত কাটাতেন।

ছুটির পরও যেসব কর্মী থেকে যায়, পরমেশ মাঝে মাঝে তাদের কাছে এসে বসেন। চা-জলখাবার আনান তাদের জন্য। কিন্তু ওভারটাইম দিতে রাজি নন। কারখানার শ্রমিকদের জন্য ওভারটাইম আছে, বাবুদের জন্য নেই। এই নিয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন টানাপোড়েন চলছে। ইচ্ছে হলে তিনি চিনে খাবার কিংবা বিরিয়ানি-চাপও খাওয়াতে পারেন, কিন্তু ওভারটাইমের প্রশ্ন নেই। আধুনিক বাণিজ্যরীতি তিনি আজও শিখে উঠতে পারলেন না।

প্রীতম আজও যথারীতি অফিসে আসেনি। আগের রাতে সে কখন বাড়ি ফিরেছে, তা নিয়ে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কেউ একটা কথাও বলেনি, শুধু পলাতক প্রশান্ত কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, সত্যেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, এখন না, এখন না।

এ সব গল্প দু' তিন দিন পরে হবে, জমে করার জন্য মাঝখানে কিছুটা সময় দরকার।

সাড়ে ছ'টার সময় চন্দন তার কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটু দূরে পরমেশ অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মুখ ফিরিয়ে চন্দনকে জিজ্ঞেস করলেন, চললে নাকি?

হ্যাঁ, স্যার।

পরমেশ একটুখন চন্দনের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন।

এ ছেলেটাকে তিনি দিন দিন বেশি পছন্দ করতে শুরু করেছেন। কম কথা বলে, কাজ ফেলে রাখে না, ঠিক সময়ে অফিসে আসে। সবাই এরকম হয় না কেন? তাঁর যদি এরকম একটা ছেলে থাকতো, কিংবা নাতি!

পরমেশ বললেন, তোমার কি বাড়ি ফেরার তাড়াহুড়ো আছে? না হলে আর একটু বসে যাও। আর সবার হয়ে যাক, তারপর একসঙ্গে বেরুবো। তুমি আমার বাড়িতে যাবে? তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা ছিল, ক'দিন ধরেই ভাবছি—

চন্দন কখনও না বলে না। পরমেশের নিজস্ব বাড়ি আমহার্স্ট স্ট্রিটে, ওখান থেকে শিয়ালদা বেশি দূরে নয়, চন্দন অনায়াসে কিছুক্ষণ সময় দিতে পারে।

তবু সে বললো, না স্যার। আজ আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

পরমেশ বললেন, ও, আচ্ছা। কালকে যদি পারো।

চন্দন অফিস থেকে বেরিয়ে, গলিপথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে প্রথম বাসটাতেই দেখলো লেখা আছে, রামরাজাতলা।

অন্যদিন এ নামটা সে লক্ষই করে না। আজ ওই নামের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি ফুটে উঠলো। একটা অন্ধকার বস্তির ঘর, সেখানে হাত-পা বাঁধা একটা মেয়ে।

শিয়ালদাগামী বাসে উঠেও চন্দন নেমে পড়লো সেন্ট্রাল এভিনিউতে। সেখান থেকে বাস বদলে সে চলে এলো সোনাগাছির মোড়ে।

আজ লোডশেডিং নেই। চন্দন অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিল না। পাশে এসে একজন দালাল গুন গুন করতে শুরু করলে সে তার দিকে তাকালোও না, সোজা এসে গেল নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে।

গেটের পাশে চেয়ারের ওপর একই ভঙ্গিতে বাবু হয়ে বসে আছে সাদা গোঁফওয়ালা লোকটি। অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিল, তবু এক নজর দেখে নিল চন্দনকে, আবার কথা বলতে শুরু করেও মুখ ফিরিয়ে চন্দনকে জিজ্ঞেস করলো, এই, ঠারো, ঠারো, তুম কাল আয়া?

চন্দন মাথা নাড়লো।

বয়েসের তুলনায় অনেক ক্ষিপ্র গতিতে চেয়ার ছেড়ে এসে লোকটি কঠিন আঙুলে চন্দনের ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে চিৎকার করতে লাগলো, এ লছমন, এ লাল্লু, আরে ইধার দেখ দেখ, ও হারামিঠো ফিন আয়া।

তিনজন লোক দৌড়ে এলো ভেতর থেকে। তাদের মধ্যে একজন নকুড়। সে চন্দনের চুলের মুঠি ধরে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললো, ইয়াদ হ্যায়, ওহি দুশমন কাল আয়া থা।

সে এক ঘুঁষি মারলো চন্দনের নাকে।

অন্যরাও চড় চাপড় মারতে শুরু করে দিল। তারপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো বাড়ির মধ্যে। কয়েকটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তাকে দেখতে। তাদের চ্যাঁচামেচিতে ফুটে উঠলো, চন্দন গত রাতে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা করে পালিয়েছে এখান থেকে। যদিও সঠিক অভিযোগটা চন্দন কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

দোতলায় আজও মদের গেলাস হাতে বসে আছে মুসাফির। তার পাশে গোটা পাঁচেক মেয়ে।

মুসাফির জোর গলায় জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে কী হয়েছে? খদ্দেরকে মারছিস কেন, বাড়ির বদনাম হয়ে যাবে না!

প্রহারকারীদের একজন বললো, ভাইদাদা, ওই শূয়ারের বাচ্চাই কাল রাধার ঘরে...কী অবস্থা করেছে!

মুসাফির বললো, দেখি, দেখি, আমার সামনে একটু দাঁড় করা তো!

অন্যরা চন্দনকে দাঁড় করিয়ে দিল, একজন ধরে আছে তার চুলের মুঠি, দু'জন তার দু' হাত।

মুসাফির বললো, দেখে তো মনে হয় ভালো মানুষের ছেলে। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। হ্যাঁ বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলো কেন? সেই প্রি-হিস্টোরিক আমল থেকে মেয়েরা মার খেয়ে আসছে। আর কত মার খাবে?

চন্দন কোনো মেয়ের গায়ে হাত তুলবে, এমন অসত্যতম, অবাস্তব অভিযোগ যেন আর হতে পারে না পৃথিবীতে।

সে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি তো কাউকে মারিনি।

মুসাফির বললো, ইউ ডিনাই, অ্যান্ড ইউ লাই? টু মোর অফেনসেস। কী দিয়ে মেরেছিলে?

চন্দন বললো, কাকে?

মুসাফির বললো, ওরে, একে ওপরে নিয়ে গিয়ে আইডেন্টিফাই করা, তারপর শাস্তি দিবি।

অন্যরা তার আগেই তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলতে তুলতে মারতে লাগলো। দু' তিনটি মেয়েও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। একটি মেয়ে আর কিছু না পেয়ে একটা ভাতের থালা দিয়ে মারতে লাগলো চন্দনের পিঠে।

তিনতলায় নয়, চারতলার ছাদে শুধু একটিমাত্র ঘর, টিম টিম করে আলো জ্বলছে। সবাই মিলে চন্দনকে নিয়ে গেলো সেখানে।

খাটে শুয়ে আছে রাধা। একটা পাতলা চাদরে গা ঢাকা, মুখের আধখানা জোড়া ব্যান্ডেজ, একটা চোখ শুধু দেখা যাচ্ছে। তাকে যেন চেনাই যায় না।

চন্দনের বুকটা ধক্ করে উঠলো। এ কে?

একজন বললো, এই দ্যাখ রাধা, কা...কে ধরেছি, এত সাহস, আজ আবার এসেছে। এটাই তো তোর ঘরে লাস্ট অবধি ছিল?

রাধা বললো, একে মেরেছো কেন?

মারবো না? এখনই কি, আরও বাকি আছে, ওর বাঁ...টা কেটে না দিই তো কী বলেছি।

এ তো কিছু করেনি? এর পরেও দু'জন এসেছিল। তারা বেশিক্ষণ থাকেনি। যেটার টাক মাথা, সেই বেশি মেরেছে।

এ নয়?

এ লোকটা নয়?

ঠিক বলছিস?

ওমা, শুধু শুধু মারা হলো। দলু সিং কাল রাত্তিরে একে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

এ লোকটা আমাকে ছোঁয়ওনি।

যে চন্দনের চুলের মুঠি ধরে ছিল, সে এর মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেছে।

চন্দন জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে?

রাধা কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরলো দেয়ালের দিকে।

একটি মেয়ে বললো, চলো, বাইরে যাই, ডাক্তার ওকে কথা বলতে বারণ করেছে।

চন্দন তবু দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। আবার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

একটি মেয়ে হাত ধরে চন্দনকে বাইরে টেনে এনে বললো, কোনো একটা জানোয়ার রাধাকে এমন মেরেছে, দুটো দাঁত ভেঙে গেছে, চোখটা কী হবে কে জানে!

চন্দন জিজ্ঞেস করলো, কেন মেরেছে?

মেয়েটি এবার খানকটা রাগী গলায় বললো, কেন মেরেছে তা আমি জানবো কী করে? সেই লোকটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

চন্দন বললো, আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

না। বললুম তো, ডাক্তার বারণ করেছে। অন্য কোনো মেয়ের ঘরে গিয়ে বসো তো।

যারা চন্দনকে মারছিল, তাদের একজন এখন নরমভাবে চন্দনের পিঠে হাত দিয়ে বললো, আমাদের ভুল হয়ে গেছে বাবু! অন্য লোক দুটো কখন এলো, কখন গেল, কেউ ঠিক দেখেনি।

দোতলায় নামতেই মুসাফির জিজ্ঞেস করলো, কী হলো রে? এত তাড়াতাড়ি মিটে গেল?

একটি মেয়ে বললো, রাধা বললো যে এ বাবু নয়। এর পর আরও দু'জন এসেছিল এক সঙ্গে।

মুসাফির বললো, ততক্ষণে আমি বোধহয় আউট হয়ে গেছি, তাই তাদের দেখিনি। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল, এ ভালো মানুষের ছেলে। ছি ছি ছি ছি ছি, অকারণে মার খেল। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। তুমি বাবা, আজ অন্য মেয়ের ঘরে যাও। এই তো বাসন্তী খালি আছে। ও তোমার রক্তটক্ত মুছিয়ে দেবে।

চন্দন বলল, না থাক, ঐ রাধার ঠিক কী হয়েছে বলুন তো? কতটা লেগেছে?

মুসাফির বলল, রা কাড়ে না রাধা, পাগোল ছাড়া পা! রাধা তো কিছু বলতেই চায় না। কষ্ট হচ্ছে খুব। তবে তুমি যদি জানতেই চাও ও আর রোজগার করতে পারবে কি না, তা পারবে। দাঁত ভেঙে গেলে আজকাল তো দাঁত বসিয়ে দেওয়া যায়। আর চোখ যদি একটা যায়ও, আর একটা তো থাকবে। এখানে যারা আসে, তারা তো শুধু রূপ দেখতে আসে না, আসে বডি হিট কমাতে।

অন্যদিকে তাকিয়ে মুসাফির হেঁকে উঠল ওরে, আমার যে গেলাস খালি হয়ে গেল, কেউ কি দিবি একটু?

চন্দন আস্তে আস্তে বলল, একটা চোখ থাকবে না?

মুসাফির বলল, না, না, না, তা বলা যায় না। তা এক্ষুনি বলা যায় না, চোখটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে, ইট নিডস টু বি প্রপারলি এক্সামিন্ড। আমার তো দেখে মনে হয়েছে, চোখের ভেতরে লাগেনি। তা হলে অনেক ব্লিডিং হতো। বাট আই অ্যাম নট অ্যান আই স্পেশালিস্ট, নট ইভ্ন আ ডক্টর।

আপনি কে?

আমি? আমি বেশ্যাবাড়ির ক্রীতদাস। এদের কাছে আমার আত্মাটা বিক্রি করে দিয়েছি, তার বদলে এরা খেতে পরতে দেয়। তবে মালটা বেশি দিতে চায় না। তোমার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, একটু মদ লাগিয়ে নাও, অ্যালকোহল ভাল অ্যান্টিসেপটিক।

চন্দন রুমাল দিয়ে নাক মুছল। লাল হয়ে গেল রুমালটা।

মুসাফির বলল, তোমার জামাটিমাতেও রক্ত লেগেছে। রাস্তা দিয়ে যাবে কী করে? জামাটা খুলে দাও, এক্ষুনি কেচে দিক, সকালে শুকিয়ে যাবে। রাত্তিরটা এখানে থেকে যাও। ওরে, তোরা আজ আর এর কাছে থেকে পয়সা নিসনি, এমন অকারণে বেচারাকে মেরেছিস।

চন্দন আর একটাও কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

গেটের কাছের লোকটি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে।

চন্দন ট্যাক্সি কিংবা বাস না ধরে হাঁটতেই লাগল। তার রক্ত মাখা জামার দিকে পথচারীরা তাকাচ্ছে কি না, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপই নেই। ভেতরে ভেতরে সে শক্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু একটা পাওয়ার জন্য, যা তাকে পেতেই হবে, কিছুতেই হারাতে দেওয়া চলবে না।

পরদিন যথারীতি যথাসময়ে অফিসে যাবার জন্য বেরুলো চন্দন। তার দাদাও ট্রেনেই কলকাতায় যায়, কিন্তু তার সময় একটু পেছিয়ে। আজ দিবাকরকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সে আর চিন্তার, চন্দন হেঁটেই স্টেশনে আসে।

দিবাকরের রিক্সা খানিকটা এগোবার পর চন্দনকে সামনে [illegible]

হাঁটতে দেখে দিবাকর চেঁচিয়ে বলল, এই চন্দন, এখানে উঠে আয়, শুধু শুধু হাঁটবি কেন?

চন্দন দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। দাদার সঙ্গে রিক্সায় ওঠা মানে ট্রেনেও দাদার সঙ্গে এক কামরায় যাওয়া। সে তা চায় না, অন্তত আজ কিছুতেই না।

রিক্সার কাছে এসে সে নম্র গলায় বলল, দাদা, আমি আজ সেলুনে চুল কাটবো, তার পরে যাবো।

দিবাকর বলল, এখন চুল কাটবি? অফিসে দেরি হয়ে যাবে না?

না, আজ একটু দেরি করে গেলেও চলবে।

চান করে খেয়ে বেরুবার পর চুল কাটা, তোর সবই অদ্ভুত। ঠিক আছে যা—।

চন্দনের অজুহাতটা একেবারে তাৎক্ষণিক পুরোপুরি মিথ্যে নয়। চুল বেশ বড় হয়েছে, কয়েকদিন ধরেই সে সেলুনে যাবার কথা ভাবছিল। বড় বড় চুল বলেই কাল ওরা তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়েছে।

ঠিক সময়ে মনে পড়ে গেছে কথাটা। চন্দন ঢুকে পড়ল পাড়ার এক সেলুনে। সেখানে বেশ ভিড়, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। হোক, যত দেরি হয়, ততই ভাল।

এর পরের ট্রেন এগারোটা দশে। এই সময় ট্রেন ফাঁকা হতে শুরু করে। ফাঁকা মানে কী, মাঝখানের স্টেশনে বসবার জায়গা পাওয়া যায় না সারাদিনের কোনও সময়েই। অফিস টাইমে অন্য লোকের ঘাম নিজের গায়ে লাগবেই, দুপুরের দিকে তবু আলগা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই থেমে থাকা ট্রেনের একটি জানলায় মুকুলিকাকে দেখে দারুণ চমকে উঠলো চন্দন। মুকুলিকার তো অনেক আগেই পেরিয়ে যাবার কথা! আজ সে মুকুলিকার সঙ্গে কিছুতেই কথা বলবে না।

চট করে সরে গেল চন্দন। মুকুলিকা তাকে দেখতে পায়নি। চন্দন সে-ট্রেনে উঠলোই না। দশ মিনিট বাদেই অবশ্য আর একটা ট্রেন এসে গেল।

শিয়ালদায় পৌঁছে মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল চন্দন। তার কোনও তাড়া নেই। প্ল্যাটফর্মে একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুকুলিকা, কী যেন কিনছে, আর এক একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে সদ্য আগত যাত্রীদের। মুকুলিকা কি তার জন্যই অপেক্ষা করছে? ঠিক দেখে ফেলেছিল? চন্দন ঢুকে পড়লো টয়লেটের মধ্যে।

কেন সে লুকোচ্ছে? মুকুলিকাকে তো ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। সেই সেদিন বরানগরে অন্ধকার সিঁড়ি থেকে ফিরে আসার পরেও কয়েকবার দেখা হয়েছে মুকুলিকার সঙ্গে, কথাও হয়েছে অনেক। ওর মায়ের লেখা বইটা এখনও পড়া হয়নি, সেজন্য তাড়াও দেয় না মুকুলিকা।

শুধু আজই তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আজ তার বুকের মধ্যে কী যেন একটা চাপ বেঁধে আছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর টয়লেট থেকে বেরুলো চন্দন। আগে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিল, এখনও মুকুলিকা দাঁড়িয়ে আছে কি না, না, নেই, প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। অন্য লোকজন আছে, তবু যেন জনশূন্য।

ঠিক এরকম দুপুরবেলা কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যায় না। এই সময় মানুষ স্নান করে, খায়, তারপর একটু বিশ্রাম নেয় হয়তো।

চন্দন কোনোদিন দেরি করে অফিস যায় না। কম্পানির মালিক বলেছিলেন, আজ তার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। চন্দনের তা মনেও পড়ল না। তার চিন্তা একমুখী।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সে কাছাকাছি একটা সিনেমা হলে নুন-শো দেখার জন্য ঢুকে পড়ল। কী সিনেমা চলছে, কী তার গল্প, তা গ্রাহ্যই করল না চন্দন, সে নিজের মধ্যে ডুবে আছে। একসময় একটু ঘুমিয়েও পড়ল।

শো শেষ হবার পর লোকজনের চলা ফেরায় তার ঘুম ভাঙল। এখন মাত্র বেলা দুটো। ঘোর দুপুর। এরপর কী করে সময় কাটানো যায়? পরের শো-এর টিকিট কেটে বসে থাকা যায় এখানেই। কিন্তু চন্দন আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সারা শরীরে যেন অসহ্য ছটফটানি।

বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরেই সে চলে এলো সোদাগাছির মোড়ে।

দিনের বেলা এখানকার চেহারা অন্যরকম। বড় রাস্তার ওপর দোকানগুলোর প্রায় সব কটারই ঝাঁপ ফেলা। একটা সিগারেটের দোকানের সামনে আগের দু'দিনই কিছু লোককে দাঁড়িয়ে জটলা করতে দেখেছে, কেউ নেই এখন। ভেতরের রাস্তা দিয়ে কিছু লোক চলাচল করছে। কিন্তু তাদের হাঁটার গতি বেশ ধীর। কোনও রকম ব্যস্ততার চিহ্নই নেই এখানে। শুধু গোটা তিনেক কুকুর ঝগড়ায় মেতে আছে।

এখন আর সেই বাড়িটার গেটের পাশে সাদা গেঁঞ্জিওয়ালা লোকটি বসে নেই। গেটটা অর্ধেকটা টানা, তার মধ্য দিয়ে গলে গেল চন্দন।

ভেতরের সদর দরজাটাও খোলা, বারান্দার পাশের দরজাগুলো প্রায় সব কটাই বন্ধ, সাড়া শব্দ নেই কারুর। দোতলায় নির্দিষ্ট স্থানটিতে মুসাফিরকেও দেখা গেল না। চন্দন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল ওপরে, কেউ বাধা দিল না তাকে।

ছাদের যে ঘরটিতে সে গত রাতে রাধাকে দেখেছিল, সেই ঘরটার দরজায় তালা ঝুলছে। কাল অত অসুস্থ ছিল রাধা, কোথায় গেল? ছাদে রোদ্দুরের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে আছে একজন রমণী, ব্লাউজ ছাড়া শাড়ি পরা, তার চুলে চিরুনি চালাচ্ছে একটি কমবয়েসী মেয়ে। এরা দুজনেই এক নজর দেখল চন্দনকে কিন্তু কিছু বলল না, কৌতূহলও প্রকাশ করল না। চন্দনও তাদের জিজ্ঞেস করল না কিছু।

আবার সে নেমে এলো দোতলায়।

শেফালির ঘরের দরজা খোলা, জাজিমে বসে তাশ খেলছে কয়েকটি রমণী। প্রত্যেকেই শুধু শায়া আর ব্লাউজপরা, শাড়ি-শূন্য। খেলায় তারা এমনই মগ্ন যে চন্দনকে লক্ষ করল না। চন্দন সে দরজা পেরিয়ে গেল।

রাধার ঘরেরও দরজা বন্ধ, কিন্তু খুলে গেল একটু ঠেলা দিতেই। এরা দিনের বেলাতেও জানলা খোলে না, আবছা অন্ধকার, তার মধ্যেই দেখা গেল খাটে কেউ শুয়ে আছে।

হ্যাঁ, রাধাই, ঘুমন্ত। আজ তার মুখে ব্যান্ডেজ নেই, কিন্তু কপালে ও থুতনিতে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো, আর একটা চোখ পিংপঙের বলের মতন ফুলে আছে। রাধা শাড়িই পরে আছে, আবশ্য অন্তর্বাস নেই।

চন্দন একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলেও কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাধা ঘুম ভেঙে তাকাল। মাধুরী বলেছিল, ঘরের মধ্যে পুরুষমানুষ এলেই মেয়েরা বুঝতে পারে। ঘুমের মধ্যেও?

রাধা বলল, কে?

চন্দন বলল, আমি, মানে, দুশো টাকা এনেছি, তোমার সঙ্গে—

টাকা দিলেই যখন তখন ঘরে আসা যায়? আমরা কি মানুষ, না মেশিন! যাও, বেরোও! আমার শরীর খারাপ।

আমি শুধু তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবো।

আমার সঙ্গে আবার কী কথা? ও, তুমি, সেই লোকটা? আবার এসেছো? এখন পুরুষমানুষ দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়। দূর হয়ে যাও!

আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞেস করবো।

তোমার লজ্জা নেই গা? কাল ওরা যখন আমায় জিজ্ঞেস করতে এলো, আমি যদি বলতুম, হ্যাঁ, এই মিনসেটাই আমাকে মেরেছে, তা হলে তোমাকে ওরা ছাতু করে দিত। আমি তোমায় বাঁচিয়েছি। আবশ্য সেটা বলে দেওয়াই উচিত ছিল। তুমি না মারলেও পুরুষমানুষই তো মেরেছে। ওদের বদলে তোমাকেই শাস্তি দিলে তবু শরীরটা জুড়োত।

ওরা তোমাকে কেন মেরেছে?

যারা সারা জীবন ধরে আমাকে মারছে, তারা তো সব তোমারই মতন, তুমি জানো না কেন পুরুষরা মারে? ভগবান ওদের বেশি গায়ের জোর দিয়েছেন, সেই গায়ের জোর ফলায়।

সবাই মারে না। না, না, সবাই মারতে পারে না। তুমি এখানে থাকলে আবার এসে কেউ মারতে পারে।

তা তো পারেই। কেউ একদিন গলাটা কেটে রেখেও যেতে পারে। যেমন পুন্নিমা মরেছে।

তা হলে এখানে থাক কেন?

তুমি কি একটা বোকচন্দর নাকি? এখানে থাকবো না তো কোন্ চুলোয় যাবো? আমাদের আর কোনও গতি আছে?

তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

তোমার সঙ্গে? বা বা বা বা! এই তো মুখ ফুটেছে, তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো?

আমার বাড়িতে। মানে, একটা কোনও ভাল জায়গায়।

বোম্বাইতে?

বম্বে যেতে চাও? তাও যাওয়া যেতে পারে।

বোম্বাইতেই ভাল হবে, তাই না?

তুমি যদি তাই মনে করো।

রাধা এবার অর্ধেকটা উঠে বসল। তার খোলা চোখটায় আগুন জ্বালিয়ে টিয়াপাখির মতন গলায় বলে উঠল, হারামির বাচ্চা! বা...।

মিটমিটে শয়তান, এইবার আসল কথাটা বেরিয়ে এসেছে। ডাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা।

সে আরও গলা চড়িয়ে ডাকল, ও শেফালিদি, শেফালিদি, শিগগির এসো—

তাস খেলুড়ে চারটি রমণীই ছুটে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে চন্দন।

রাধা বলল, এই দেখো, আর একটা আড়কাঠি এসেছে। আমাকে বোম্বাই নিয়ে যেতে চায়।

শেফালি এগিয়ে এসে ভাল করে দেখে বলল, সেই লোকটা না? আবার এসেছে? তোর কি মরণের ভয় নেই?

ঠাস করে সে একটা চড় কষালো চন্দনের গালে।

চন্দন বলল, আমি তো ওকে বম্বে নিয়ে যেতে চাইনি। ও নিজেই বলল—

রাধা বলল, তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাসনি?

চন্দন বলল, হ্যাঁ, তাই চেয়েছি।

রাধা বলল, ওসব আমরা বুঝি না? ভাল মানুষ পেয়ে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এখেন থেকে নিয়ে যাবি। আর বোম্বাইতে গিয়ে বিক্রি করে দিবি ভাল দামে। তারপর সেখান থেকে আরবদের দেশে, তারা হাত পায়ে ছেকল বেঁধে রাখে। শেফালিদি দেখো, এ বদমাসটা যেন পালিয়ে না যায়।

শেফালি বলল, ইস, পালাবে! নকুড়, ভুতোকে এক্ষুনি ডাকছি।

অন্য একটি মেয়ে বলল, এটাকে পুলিশে দিতে হবে।

শেফালি বলল, পুলিশে দিয়ে কী হবে? আগেও একটা আড়কাঠিকে ধরেছিলুম মনে নেই? পুলিশে জমা দিয়ে কী লাভ হলো? পুলিশ ঘুষ খেল না কী খেল, ছেড়েই দিল তাকে। বরং আমাদের সমিতির সীমাদিদিকে খবর দিতে হবে।

রাধা বলল, আমার কাছে আগেও একজন এসেছিল, এরকম একই কথা বলেছিল। আমি ফাঁদে পা দিইনি। কিন্তু বুলিটার কী হল? বুলিটা যে এ-বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল, আর পাত্তা নেই। বুলিও নিশ্চয় কোনও দালালের পাল্লায় পড়েছে।

চন্দন বলল, আমি কিন্তু এসব কিছু জানি না।

একটি মেয়ে হেসে উঠে বলল, কিছু জানে না বলছে যে গো। মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে।

শেফালি বলল, এই রাধা, তুই উঠিস না। শুয়ে থাক। আমরা এর ব্যবস্থা করছি।

চারটি নারী চন্দনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে চলে এসেছে নকুড় ও আর একটি পুরুষ।

নকুড় কোনও কথা না বলে ছুটে এসে একটা রদ্দা কষালো চন্দনের ঘাড়ে। চন্দন মাটিতে পড়ে গেল।

শেফালি বলল, মারিস না, মারিস না, সীমাদি আগেই মারতে বারণ করেছে।

চন্দনকে মাটি থেকে তুলে সবাই মিলে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তাকে ঠেলে দিল একটা ফাঁকা ঘরের মধ্যে, তারপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে।

দশ

ঘাড়ে খুব জোরে লেগেছে চন্দনের। তার তো মার খাওয়ার একেবারেই অভ্যেস নেই। বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, সেই বয়েস থেকেই চন্দন শান্ত শিষ্ট। আউটডোর খেলাধুলোর দিকেও তার ঝোঁক ছিল না। তার সময় কাটে বই পড়ে ও গান-বাজনার রেকর্ড শুনে। কৈশোর বয়েস পর্যন্ত বাবার কাছে মাঝেমাঝে চড়-চাপড় খেয়েছে, সে তেমন কিছু নয়।

রদ্দা খেয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছিল চন্দন, আর একটু হলেই হয়তো জ্ঞান হারাতো।

মেঝেতে বসে চন্দন ঘাড়ে হাত বুলোতে লাগল। সে অবশ্য ব্যথা পায়নি, এখনও খালি মনে হচ্ছে, এরা তাকে ভুল করে মারছে। কাল আর আজও। নিশ্চয়ই এদের ভুল ভেঙে যাবে। কী সব বলছে আড়কাঠি না দালালের কথা। সব মানুষ কি সব কিছু পারে?

তবে, রাধা যে বলল, একজন পুরুষমানুষের দোষের জন্য অন্য পুরুষকে শাস্তি দেওয়া যায়। অন্য কারুর দোষের জন্য সে শাস্তি পাবে?

এ ঘরটাতেও জাজিমের ওপর চাদর বেছানো। একদিকে টাঙানো রয়েছে অনেকখানি হলুদ রঙের পর্দা।

কৌতূহলী হয়ে চন্দন পর্দাটা সরিয়ে দেখতে গেল।

সেখানে রয়েছে একটা সেসিন ও জলের কল, সাধান, একটা নর্দমা, তাতে হিসির গন্ধ। একটা তাকে নানা আকারের কয়েকটা কৌটো, একটা দড়ি টাঙানো, তাতে কয়েকটা শাড়ি ব্লাউজ ঝুলছে। কয়েকটা মদের বোতলে সম্ভবত খাবার জল।

একটু বাদে দরজাটা খুলে গেল।

মাঝখানে দুজন মহিলা, তাদের ঘিরে সাত-আটজন নারী-পুরুষ।

প্রথম কিছুক্ষণ ওরা কোনও কথা বলল না। শুধু তাকিয়ে রইল। যেন চিড়িয়াখানার কোনও খাঁচার জানোয়ার দেখছে।

চন্দন ভাবল, এবার ওরা তাকে মারবে। খুব মারবে? শুধু লাথি-ঘুঁসি, না লোহার ডাণ্ডা, ছুরি দিয়ে। সে ওদের হাতগুলো খুঁজতে লাগল।

মহিলা দুটির হাতে চুড়ি-আঁটি বা কোনও অলঙ্কারই নেই। শাড়ি পরার ধরন দেখলে মনে হয়, তারা এ-বাড়ির অধিবাসিনী নয়। শাড়ি পরার ধরনে কী তফাৎ? তা চন্দন বলতে পারবে না, তবে কিছু একটা আছে।

এবং মহিলা দুটির মুখ। তাতে আছে শিক্ষার প্রলেপ।

কিছুটা লেখাপড়া শিখলেই মুখের চেহারা বদলে যায় কী করে? দেখলেই বোঝা যায়। একটি বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতে আসা মেয়ে, আর একটি কলেজে পড়া মেয়ের মুখ কিছুতেই একরকম হয় না। শরীরের গড়ন কিংবা স্বাস্থ্য একই ধরনের হতে পারে, শুধু মুখের ওপর বোঝা যায় শিক্ষার ছাপ।

একটুক্ষণ পরে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

চন্দন বলল, আমার নাম শুনলে তো আপনারা চিনবেন না। আমি একজন সাধারণ মানুষ।

পাশের মহিলাটি বলল, আপনি দুপুরবেলা এখানে এসেছেন কেন?

পেছন থেকে একজন বলল, কালকেও এসেছিল।

অন্য একজন বলল, কাল দুপুরে আসেনিকো, সন্ধেবেলা।

চন্দন বলল, দুপুরবেলা যে আসা নিষেধ, তা আমি জানতাম না। দরজা খোলা ছিল।

নিষেধের প্রশ্ন নয়। আপনি কি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন? আপনি প্রথমেই টাকা দিতে চেয়েছিলেন।

এখানে সময়ের হিসেব করে টাকা দিতে হয়। আমি রাধার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, সেইজন্যই

শুধু কথা বলতে এসেছিলেন? আপনি ওকে মুম্বই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

না। আমি মুম্বইতে কাউকে চিনি না। রাধাই একবার জিজ্ঞেস করল, ওখানে যাওয়া যায় কি না। আমি তাতে রাজি ছিলাম। শুনুন, শুনুন, একজন কেউ রাধাকে মেরেছে, সেজন্য আমি শাস্তি নিতে রাজি আছি। কিন্তু আড়কাঠি না কিসের কথা বলছিল, সেসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আপনি শাস্তি নেবেন? আপনি মেরেছেন?

পেছন থেকে কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, না, না রাধা বলেছে, লোকটা মারেনি। কিন্তু অন্য মতলবে এসেছিল।

আপনি মারেননি, তবু শাস্তি নিতে চান কেন?

একজন পুরুষ মেরেছে। জন্য কোনও পুরুষকেই তো সে জন্য শাস্তি পেতে হবে। না হলে ওর মন শান্ত হবে না। আমি, মানে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মহিলা দুজন নিম্ন স্বরে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করল, তারপর তাদের একজন বলল, ঠিক আছে, আপনি আসুন আমাদের

সঙ্গে। আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে একটু কথা বলবো।

চন্দন জাজিমের ওপর বসেইছিল, উঠে দাঁড়াল।

একজন চেঁচিয়ে বলল, দেখবেন দিদি, যেন না পালায়।

একজন মহিলা বললেন, এই নিয়ে আর চ্যাঁচামেচি করবেন না। আমরা দেখছি। আপনাদের শুক্লাদি তো আমাদের অফিসে আছেন, তাঁর কাছ থেকে সব জানতে পারবেন।

সে বাড়ি থেকে বেরুবার পরেও দুজন পুরুষ ওদের পেছনে পেছনে এল। তাদের একজনের হাতে লোহার রড। একটা রকে বসে থাকা কয়েকজন লোক এমন ভাবে তাকাল, যে মনে হয় তারাও জানে কী ব্যাপার ঘটছে। চন্দন আগে কখনও এত লোকের কৌতূহলের কেন্দ্র হয়নি।

মোড়ের মাথায় এসে রাস্তা পার হতে গিয়েও থেমে গিয়ে একজন মহিলা অপরজনকে বলল, সুমিতাদি সমিতির অফিসে ট্রেনিং ক্লাস চলছে, চায়ের দোকানে গিয়ে বসলে হয় না?

যার নাম সুমিতা, সে চন্দনকে জিজ্ঞেস করল, আপনি চা খাবেন?

চন্দন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

খানিকটা হাঁটার পরেই একটা চায়ের দোকান। এখনও ভাল করে বিকেল হয়নি বলে সে দোকান একেবারে ফাঁকা। পুরুষ দুজন আর ভেতরে ঢুকল না, চন্দনকে নিয়ে মহিলাদুটি বসল একেবারে শেষের টেবিলে।

সুমিতা বলল, আপনার নামটা জানতে পারি। আমার নাম সুমিতা মজুমদার আর এর নাম দেবিকা দত্ত।

দেবিকাকে চন্দন নিজের নাম জানাল। বলল, নমস্কার।

চন্দনবাবু, আপনার নামে যে অভিযোগটা এনেছে, মানে ওদের ধারণা হয়েছে, তা খুবই গুরুতর। সেটা সত্যি হতেও পারে, নাও হতে পারে। যারা এইসব কাজ করে তাদের ব্যবহার কিংবা চেহারা দেখলে বোঝা যায় না, অনেকেই ভদ্র, শিক্ষিতও হয়, কিন্তু তাদের বিবেক বলে কিছু নেই।

সুমিতা বলল, আমরা সরকারি লোক নই। আমাদের কোনও আইনগত ক্ষমতা নেই। আমরা যা প্রশ্ন করবো, তার উত্তর আপনি নাও দিতে পারেন। ইউ হ্যাভ এভরি রাইট নট টু আনসার। তবে, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একেবারেই সহযোগিতা করতে না চান, তা হলে আমরা থানায় কমপ্লেন করতে বাধ্য হব, তারপর পুলিশ যা করবার তাই করবে।

চন্দন দেখল, রাধার বাড়ির পুরুষ দুজন দাঁড়িয়ে আছে দোকানের সামনের রাস্তায়। ওরা পাহারা দিচ্ছে।

দেবিকা বলল, আগে আমাদের পরিচয়টা জানানো দরকার। আমরা একটা এন জি ও করি। আমাদের সংস্থার নাম দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি। উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে আমরা যৌন কর্মীদের মধ্যে কাজ করছি। শুরু হয়েছিল যৌন রোগের বিস্তার, মেনলি এইড্‌সের প্রতিরোধ করার জন্য, সে ব্যাপারে যৌনকর্মীদের সচেতন করে তোলা, তারপর ওদের নানান দৈনন্দিন সমস্যা, বিশেষত নিরাপত্তা নিয়েও কিছু কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করি। ওরা নিজেরাও ছোট ছোট সংগঠন করেছে।

আমার নামে কী অভিযোগ?

একটা তো আপনি নিজেই দেখেছেন। ভায়োলেন্স। আপনার নামে অবশ্য সে অভিযোগ করা হয়নি। বরং ভুল করে আপনাকে মারধর করেছিল। কিছু কিছু লোক আসে, তাদের এমনই বিকৃত মানসিকতা যে, এই নিরীহ মেয়েগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে মারে।

কেন মারে?

সাধারণভাবে বলা যায়, সেডিজম্। যারা একেবারে পারভার্ট, তাদের সেক্সুয়াল অ্যাক্টের একটা ভূমিকা আছে। এতেই আনন্দ পায়। কিন্তু তার তো একটা লিমিট থাকবে। এক-একজন এমন ভাবে মারে, হাত-পা ভেঙে দেয়, এমনকি খুনও করে ফেলে।

কোনও কোনও মেয়ে ওই সব লোকদের দু'একটা দাবি মানতে চায় না। যেমন সাকিং, তার জন্যও মার খায়।

যাকগে, চন্দনবাবু সম্পর্কে যখন এই অভিযোগটা নেই, তখন অন্যটার কথা বলা যাক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় ভয়ংকর ভাবে স্লেভ ট্রেড চালু আছে।

স্লেভ ট্রেড?

বাংলাদেশ, নেপাল, আমাদের পশ্চিমবাংলার গ্রাম থেকেও অনেক মেয়েকে ফুসলিয়ে কিংবা চুরি করে নিয়ে আসে একদল দালাল।

দুঃখের বিষয়, সেই দালালদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, কিছু কিছু মহিলাও জড়িত থাকে, টাকার জন্য মেয়ে হয়েও তারা মেয়েদের সর্বনাশ করে।

সেই সব চুরি করা মেয়েদের কিছুদিন কলকাতায় রেখে তারপর চালান দেয় বম্বেতে। বম্বেতে খুব ভালো বাজার। সেখান থেকে আবার কিছু কিছু মেয়ে এক্সপোর্ট হয়ে যায়। এই মেয়ে বিক্রির চক্র দিন দিন বাড়ছে। পুলিশ যে কেন সেটা ভাঙতে পারে না। মাঝে মাঝে দু' একজনকে ধরে, বাট দ্যাট ইজ ওনলি দা টিপ অফ দা আইসবার্গ।

রাধা কেন আমার সঙ্গে বম্বে যাবার কথা বললো?

আপনি নিজের সেই প্রস্তাব দেননি?

আমি তো বম্বেতে কারুকে চিনি না!

ব্যাপারটা আপনাকে আর একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। আপনি না চিনলেও এখানে অন্য এজেন্ট আছে। বাইরে থেকে তো অনবরত মেয়ে চুরি করে আনছেই, কিছুদিন ধরে দেখছি। এই সব পাড়ায় অল্পবয়েসী, স্বাস্থ্যবতী কিছু কিছু মেয়েকে অনেক বেশি রোজগারের লোভ দেখিয়ে কেউ কেউ বিয়ের ছলনা করেও ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। দু' সপ্তাহ আগেই রাধার কাছে এই রকম একজন—

এই সময় চায়ের দোকানে ঢুকলো মুসাফির।

একটা চেক লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা, পায়ে রবারের চটি। মুখে তিন চার দিনের দাড়ি। প্রথমে অন্য টেবিলে বসতে যাচ্ছিল, এদের দেখতে পেয়ে হাসি মুখে কাছে এগিয়ে এসে বললো, এখানে কিসের মিটিং হচ্ছে? সুমিতাদি, আমিও বসি? চা খাওয়াবে?

সুমিতা বললো, হ্যাঁ, বসুন না।

মুসাফির বললো, খিদে খিদে পেয়েছে, বুঝলে? এ দোকানের কাটলেট একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। একটা অর্ডার দেবে নাকি আমার জন্য?

সুমিতা বললো, ঠিক আছে, খান কাটলেট।

মুসাফির বললো, আমাদের ছোটবেলায়, বুঝলে, চিকেন কাটলেটকে বলা হতো ফাউল কাটলেট। চিকেন মানে তো ছোট মুর্গি। ফাউল কাটলেট, ফাউল কারি, এখন আর এসব শুনি না। সবই চিকেন। এক প্লেট ফাউল কাটলেটের অর্ডার দিলে দু' খানা দিত।

সুমিতা হেসে বললো, তার মানে আপনি দুটো কাটলেট খেতে চান? তা হবে না? একটাই পাবেন।

মুসাফির বললো, তা হলে দুটো সিগ্রেট দাও। একটা চায়ের আগে খাবো, একটা পরে।

দেবিকা বললো, এটা কী হচ্ছে ভাইদাদা? আমরা কি সিগারেট খাই?

মুসাফির বললো, আজকাল তোমাদের ক্লাসের অনেক মেয়েই তো সিগারেট খায়। তোমরা খাও না, ঠিক আছে, দুটো আনিয়ে দাও।

দেবিকা বললো, না, আমরা সিগারেট কিনেও দেব না!

মুসাফির বললো, কিনলেও বুঝি পাপ হয়? তা হলে আমাকে পাঁচটা টাকা দাও, ভিক্ষে চাইছি, ভিক্ষে দাও—

এবার সে চন্দনের দিকে ফিরে বললো, এ মক্কেলটি কে? চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ওঃ হো, কালই ফল্‌স সন্দেহ করে এ লোকটাকে খুব মারধোর করা হয়েছিল না? আজ আবার এসেছে কিসের জন্য?

সুমিত বললো, আমরা ওকে স্লেভ ট্রেডের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিলাম।

মুসাফির বললো, বোঝাচ্ছিলে? তার মানে, তুমি কি সাদা পোশাকের পুলিশ নাকি? আই বি?

চন্দন বললো, না, আমি পুলিশ নই। এঁরা ভাবছেন, আমি রাধাকে চুরি করতে এসেছি।

মুসাফির প্রবল অট্টহাস্য করে বললেন, অ্যাঁ; তোমাদের মাথা খারাপ! একবার মার খেয়ে আবার আসবে? এই সব মেয়েমানুষের দালালাগুলো আসলে খুব কাওয়ার্ড হয়। একবার আইডেন্টিফায়েড হয়ে গেলে আর সে রাস্তা মাড়ায় না। মুখ দেখেই বোঝা যায়, এ লোকটা সে টাইপ নয়।

সুমিতা বললো, আমাদের একটা ব্যাপারে খটকা আছে—

মুসাফির বললো, তোমরা ভাবছো, মেয়ে বিক্রি এখন বাড়ছে? আগেও ছিল, বরং বেশি ছিল। বড় বড় পণ্ডিতরা বলে, বেশ্যাবৃত্তি হচ্ছে মেয়েদের আদিমতম পেশা। সে গর্ববগুলো এ কথা বলে না যে এটা পুরুষদের আদিতম ব্যবসা। মেয়েরা কি ইচ্ছে করলে এ পেশা নিতে পারে? পুরুষরা চালায়। এখনও পৃথিবীর সব দেশে মেয়ে বিক্রি হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো, বিরাট মেয়ে-বাজার।

দেবিকা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইদাদা, পুরুষ বিক্রি হয় না কেন?

মুসাফির বললো, আগেকার দিনে স্লেভ ছিল, এখনো পুরুষ স্লেভ আছে নানা ফর্মে। তবে তুমি যে সেক্সে পুরুষ বিক্রির কথা বলছো, তার বাজার নেই। মেয়েদের পারচেজিং পাওয়ার নেই। কিংবা কোনো বড় লোকের বেটির টাকা পয়সা থাকলেও দু' চারটে পুরুষ কিনে সেক্সের জন্য পুষবে, কোনো সমাজই তো এটা মেনে নেবে না। দেখো না, আমি নিজেকে বিক্রির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতোন, মৃচ্ছকটিকের চারুদত্তের মতোন গান গেয়ে গেয়ে ঘুরেছি আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে—। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে ঠেকেছি!

দেবিকা আবার জিজ্ঞেস করলো, ভাইদাদা, কেন আপনি নিজেকে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন, আজও বুঝতে পারি না। মনে হয়, আপনি কোনো ভালো পরিবার থেকে—

মুসাফির বললো, আমার লাইফ স্টোরি নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। মুসাফিরের কোনো পূর্ব-জীবন থাকে না। কী খটকার কথা বলছিলে এর সম্পর্কে, সেটা বলো!

সুমিতা বললো, সকালবেলা রাধার সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। পরশুদিন ইনি রাধার ঘরে গিয়েছিলেন, এক ঘণ্টা মতন ছিলেন, ক্যাপের দামও দিয়েছিলেন কিন্তু একবারের জন্য ওকে একটু ছুঁয়েও দেখেননি। তবু কাল আবার—

মুসাফির বললো, প্রথম দিনটা অনেকে লজ্জা পায় কিংবা ভয় পায়। আস্তে আস্তে সে সব ভাঙে—

সুমিতা বললো, কালকে যা হোক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, কয়েকজন ওকে মেরে ছিল। যাই হোক, উনি নিজের চোখে দেখে গেছেন যে রাধা সাঙ্ঘাতিক আহত, অসুস্থ। কয়েকদিন অন্তত কোনো কাজই করতে পারবে না। তবু উনি আজ দুপুরে আবার এলেন কেন?

মুসাফির বললো, হ্যাঁ, এটা তো খটকা বটেই! বেশ্যাদের অসুখ হতে নেই, জ্বর হতে নেই, মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বাবুদের সামনে আসতে নেই। সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকবে, না হলেই তারা এলেবেলে। অসুস্থ জেনেও একজন বাবু কেন তার কাছে আসবে? সত্যিই তো কেন ভাই তুমি আজ এসেছিলে?

চন্দন এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? কেউ বুঝবে না!

তার বন্ধুর কাকিমা, সেই মাধুরী ছাড়া আর কোনো নারী চন্দনের হৃদয়ে অলোড়ন তোলেনি। বিশেষত মাধুরীর মুখের সেই অসাধারণ হাসি, যখন তিনি মৃত্যুভয়ের কথা বলছিলেন। চন্দনের মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হয় না। তখন সে মাধুরীর পদ-চুম্বন করতে পারতো।

মাধুরীকে সেই একবারই দেখেছিল চন্দন, হয়তো জীবনে আর কখনো দেখা হবে না। অনেক বছর পর দেখা হলেও চন্দনকে চিনতে পারবেন না। চন্দনকে তাঁর মনে রাখবারও কোনো কারণ নেই।

সেদিন রাধার ঘরে বসে থেকেও তাকে ভালো লাগেনি চন্দনের। হাবভাব কেমন যেন নকল নকল। গড় গড় করে সে নিজের জীবনের যে কাহিনী শোনাচ্ছিল, তার অনেকটাই বোধহয় সত্যি নয়। স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই চন্দন বুঝেছিল, তার মধ্যে মাঝে মাঝে কৃত্রিমতার গন্ধ আছে। কিন্তু যখন সে তার কপালের ফাটা দাগটা... তার বাবা তাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল বাচ্চা বয়েসে, তখন তার যে কণ্ঠস্বর, সেই স্বরে মানুষের পক্ষে মিথ্যে বলা অসম্ভব। তার বাবা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাকে কোপ মারতে আসছে। সে কথা বলতে বলতেও রাধা হাসছিল, অদ্ভুত ধরনের হাসি, ঠিক তখনই শিহরন হয়েছিল চন্দনের শরীরে। এই হাসির সঙ্গে মাধুরীর মুখের আশ্চর্য মিল! সেই সময় সে রাধাকে ছুঁতে পারতো, দু' হাত দিয়ে ধরতে পারতো রাধার মুখ, কিন্তু বাধা পেয়ে গেল, এসে গেল অন্য লোক।

পরদিন চন্দন রাধার সেই মুখটা খুঁজতে গিয়েছিল আবার। কিন্তু রাধার মুখ বদলে গেছে, তার কয়েকটা দাঁত নেই, একটা চোখ ঢাকা, মুখে ব্যান্ডেজ। সে দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি চন্দন। মাধুরীর মতন রাধার

এই মুখটাও কি হারিয়ে যাবে? না, না, যে-কোনো উপায়ে রাধাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার দাঁত, ভালো করে তুলতে হবে তার চোখ, সে আবার স্বাভাবিক হবে, আবার হাসবে! নইলে চন্দন একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

এ সব কথা কি কারুকে বলা যায়? চন্দন চুপ করে রইলো।

অন্য তিনজন ব্যগ্র ভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। তাড়াও দিচ্ছে না, তবু সেই নৈঃশব্দ্যের একটা তরঙ্গ আছে।

একটা কিছু বলতেই হবে, তাই চন্দন মুখ নিচু করে বললো, ওকে আমার ভালো লেগেছে। ও কেমন আছে, তাই দেখতে এসেছিলাম।

মুসাফির প্রায় চোখ কপালে তুলে বললো, তাজ্জব কি বাৎ! এমন কথা জন্মে শুনিনি! অসুস্থ বেশ্যাকে কেউ দেখতে আসে?

চন্দন বললো, মানুষের অসুখ হলে কি মানুষ দেখতে আসে না?

মুসাফির বললো, মানুষ? মানুষের নিয়ম কি বেশ্যাদের সম্পর্কে খাটে? বেশ্যাদের কাছে ব্যাটাছেলেরা তো আসে শুধু একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে! তুমি সত্যি কথা বলছো, ব্রাদার?

দেবিকা বললো, আমার মনে হয় উনি সত্যি কথাই বলছেন।

মুসাফির বললো, তা হলে তো মনে হচ্ছে এটা প্রেম!

দেবিকা বললো, প্রেম কি ভাইদাদা?

মুসাফির বললো, আমরা কথায় কথায় বলি না, প্রেম প্রেম? তা প্রেম তো পৃথিবী থেকে উঠেই গেছে, ও আর হবে না, ওর কাছাকাছি যা, তাকে প্রেম বলা যেতে পারে।

সুমিতা বললো, দাঁড়াও, দাড়াও। চন্দনবাবু, আপনি বলছেন, রাধাকে বম্বে নিয়ে যাবার কথা আপনি নিজের থেকে বলেননি। কিন্তু আপনি রাধাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেটা কি ঠিক?

হাাঁ।

কেন?

যাতে ওকে আর কেউ কখনো না মারে। ওর ভালো করে চিকিৎসা হয়।

কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

তা ঠিক ভাবিনি। হঠাৎ মনে এলো।

আপনি কি একা থাকেন? না বাড়ির লোকের সঙ্গে?

একা থাকি না। বাবার বাড়ি, সোদপুরে থাকি।

জয়েন্ট ফ্যামিলি, সেখানে আপনি রাধাকে নিয়ে যেতে পারবেন? ওর কী পরিচয় দেবেন?

চন্দন অসহায় ভাবে সুমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। এই বুদ্ধিমতী মহিলা তাকে উকিলের মতন জেরা করছে। সে তো সত্যি কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আসেনি। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ছিল, কোনো ক্রমেই যেন রাধার সেই হাসিটা হারিয়ে না যায়। সে একটি মেয়ের মুখের হাসি রক্ষা করতে চেয়েছে!

সুমিতা আবার বললো, কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি ম্যারেড?

না।

মুসাফির জিজ্ঞেস করলো, রেস্তো'র জোর আছে? বাপ বড়লোক, না নিজের কাঁচা টাকা?

চন্দন বললো, টাকা? আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার্ড। আমি একটা ওষুধ কম্পানিতে কাজ করি। অফিসার না, সাধারণ।

তা হলে ব্রাদার, তুমি ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলে কেন? কোথায় রাখবে, কী পরিচয় দেবে? ও যে বেশ্যা, সেটা কতদিন লুকোতে পারবে? বেশ্যা জানলেই ঘেড়ে-বুড়ো সবাই রে-রে করে উঠবে। এখন সমাজ-কমাজ বলে কিশ্যু নেই, কিন্তু এই একটা কেসে সবাই সমাজ রক্ষক। বেশ্যা মানেই তো নরকের পোকা, তার শরীরটাই পাপ, যে-সব শুয়োরের বাচ্চারা অত মেয়েছেলেদের দেখে হ্যাংলার মতন জিভে লালা ঝরায়, বাড়ির অল্পবয়েসী কাজের মেয়েকে রেপ করে, তারাও..... তুমি সেই পাবলিক অ্যাপাথি সামলাবে কী করে?

দেবিকা বললো, ভাইদাদা, এখন আর এসব কথা বলার কোনো মানে হয় না। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন রাইটের জন্য লড়ছি। ওরা যা করছে, সেটিও অন্যান্য পেশার মতনই একটা পেশা। তার স্বীকৃতি দিতে হবে। ডিগনিটি অফ লেবার কথাটা এখন খুব চালু আছে। এটাও একটা কাজ নয়? বাধ্য হয়েই হোক কিংবা পুরুষদের চক্রান্তেই হোক, ওরা এই পেশাটা মেনে নিয়েছে। ভিক্ষে না করে নিজেরা রোজগার করছে, তাতে আত্মসম্মান থাকবে না কেন?

মুসাফির বলল, আমিও তো তাই বলি, কত ভদ্র ঘরের বউ-মেয়েরা ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচে, ব্যাভিচার করে অন্যের সংসার ভাঙে, তার চেয়ে খোলাখুলি এই পেশাটা মন্দ হবে কেন? এই যে রাধা মার খেয়েছে, এটাকে বলা যেতে পারে অকুপেশানাল হ্যাজার্ড। কারখানায় যারা কাজ করে, সেই সব ওয়ার্কারদের মাঝে মাঝে মেশিনে হাত-পা কেটে যায় না? যে-সব মিস্তিরিরা ভারা বেঁধে তিনতলা-চারতলা বাড়ির দেওয়ালে কাজ করে, তারাও পা পিছলে কখনো কখনো পড়ে যায়, পুলিশরা পাবলিকের কাছে মার খায়। সব সার্ভিসেই রিস্ক আছে।

দেবিকা বলল, যতদিন না পর্যন্ত দেশ বা সরকার সমস্ত মানুষকে কাজ দিতে পারছে, ততদিন তো এই পেশা থাকবেই। এটা মেনে নিলেই তো যত সব আজেবাজে মরাল আপত্তি ঘুচে যেতে পারে। এটা কেন লোকে বোঝে না, একজন ওয়ার্কার যদি অফিসার পদে প্রমোশন পায়, সে যেমন খুশি হবে, তেমনি একজন সেক্স ওয়ার্কারও অন্য কোনো নিরাপদ প্রফেশান পেলে আনন্দের সঙ্গে পাড়া ছেড়ে চলে যাবে। তা নয়, লোকে এখনো চায়, মেয়েরা পরের বাড়িতে ঝি গিরি করুক, রাস্তায় ছেলে-কোলে নিয়ে ভিক্ষে করুক, মাতাল স্বামীর বউ হয়ে রোজ পিটুনি খাক, তাতে কোনো আপত্তি নেই, শুধু...

চন্দন এসব কিছুই শুনছে না। সে শুধু দেখতে পাচ্ছে রাধার এক চক্ষু বন্ধ হওয়া বিকৃত, আহত মুখ। সে মুখে কি আর কোনোদিন হাসি ফুটবে?

আলোচনার মাঝখানে মুখ তুলে চন্দন বলল, আমি তাহলে কী করব?

অপর তিনজন নিজেদের বাক্যবিন্যাসে ঘোর হয়ে ছিল, চন্দনের এ কথা শুনে হেসে উঠলো এক সঙ্গে।

সুমিতা বলল, আপনি কী করবেন, তা আমরা বলব কী করে? আপনি ঠিক কী চান, তাই-ই তো বুঝতে পারছি না।

দেবিকা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি রাধাকে বিয়ে করতে চান?

চন্দন ভুরু কুঁচকে বলল, বিয়ে? হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। অনেকে তো বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে।

সুমিতা বলল, এক মিনিট, এক মিনিট। ব্যাপারটা অত সোজা নয়, হঠাৎ আবেগের বশে এ পাড়ার একটি মেয়েকে বিয়ে করলেই সেটাকে ভাল বলা যায় না। কেউ কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে লোক দেখানো বিয়ে করে, তারপর মেয়েটিকে চালান করে দেয়। ইনি তা করবেন বলছি না, কিন্তু কেউ কেউ ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করেও শেষ পর্যন্ত সোসাল টেনশান সামলাতে পারে না। হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দেয়। এ রকম কয়েকটা কেস হয়েছে। তখন মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলে সে আরও বিপদে পড়ে। আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করা এত শক্ত হয়—

মুসাফির বলল, বার্নার্ড শ' বলেছিলেন না, ম্যারেজ ইজ আ লিগালাইজ্‌ড প্রস্টিটিউশান! বিনি পয়সার ভোজ, এনজয়মেন্ট অফ সেক্স! বউকে ভাত-কাপড় দেবার জন্য কিছু পয়সা খর্চা করতে হয় বটে, কিন্তু রাঁধুনি, ঝি, ধোপার খরচও বাঁচানো যায়। তবে ঐ যে সেক্সের মধু, সেটা দেড় দু'বছরের মধ্যেই একটু একটু তেতো হতে শুরু করে। কী, ঠিক বলছি না? ও, তোমরা জানবে কী করে, তোমরা দু'জনেই তো বিয়ে করোনি!

সুমিতা বলল, আপনিই বা জানলেন কী করে? আপনি কি বিয়ে করেছিলেন?

মুসাফির ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশব্দে হেসে বলল, বলেছি না, আমার লাইফ স্টোরি নিয়ে কৌতূহল দেখিও না। আমি সবজান্তা!

চন্দনের মনে পড়ল, রাধার মুখে শোনা লায়েফ এস্টোরি। এই মুসাফিরের কাছেই শিখেছে বোধহয়।

মুসাফির আবার বলল, তখন সংসারের অন্যান্য ঝামেলা, বউটার যখন তখন পেটে ব্যথা, বাড়িওয়ালা জল দিচ্ছে না, পাড়ার ছেলেরা দুপুর বেলা এসে চাঁদা চায়, বাজার থেকে পচা মাছ আনার জন্য মুখ ঝামটা, এই সবে স্বামীটা তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে! এমনিতেই পুরুষ মানুষরা বহু ভোগী, নেচারই তার মধ্যে এই প্রবৃত্তিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে কী করবে, বিয়ে দিয়ে এই আর্টিফিসিয়াল বাঁধন দিয়ে পুরুষকে বেঁধে

রাখার চেষ্টা হয়, কিন্তু অনেক সময়ই সেটা টেকে না, সেই সব পুরুষ তখন অন্য মেয়েমানুষের দিকে ঝোঁকে, কেউ গোপনে কেউ প্রকাশ্যে। একমাত্র বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেলে এই বাঁধন তবু খানিকটা টাইট হয়, কারণ স্নেহ বস্তুটাও প্রকৃতির দেওয়া একটা প্রবৃত্তি। আর একটা জিনিস দেখবে, পুরুত ডেকে, মন্ত্র যন্ত্র পড়ে, অনেক লোকজনকে খাইয়ে যে সামাজিক বিয়ে হয়, সেটা চট করে ভাঙে না, একটা সংস্কার কাজ করে। এখন তাও কিছু কিছু ভাঙছে বটে, কিন্তু দেরি লাগে। আর কাগজে সই করা বিয়ের মধ্যে সেই সংস্কার এখনো গেঁথে যায়নি। মেয়েটার চরিত্রে যদি একটু খুঁত বার হয়, তাহলে তো কথাই নেই, বিবেকের যন্ত্রণাও নেই, চট করে কাগজ ছেঁড়ার মতন বিয়েটাও ছিঁড়ে ফেলা যায়। মেয়েটা যদি পূর্ব জীবনে বেশ্যা থাকে, তাহলে উদার স্বামীও একটু ঝগড়াতেই সেই পরিচয়টা খুঁড়ে বার করে, দাঁত কিড়মিড় করে বউকে বলে, যা না, যেখানে ছিলি, সেখানেই ফিরে যা! এ রকম অনেক দেখেছি!

দেবিকা বলল, কিন্তু এসবই নিগেটিভ কথাবার্তা। এর উল্টোটাও তো হতে পারে। রাধা যদি এই ভদ্রলোককে বিয়ে করতে রাজি হয়, তাহলে সুমিতাদি, আমাদের আপত্তি জানাবার কোনো অধিকার নেই।

মুসাফির বলল, রাধা রাজি হবে? কোন্ দুঃখে! আমিই তাকে বারণ করে দেব!

সুমিতা বলল, আমারও দৃঢ় ধারণা, রাধা রাজি হবে না। এঁকে তো ভাল করে চেনেই না।

দেবিকা বলল, তবু আমাদের উচিত রাধার মতামত নেওয়া।

মুসাফির বলল, আজ নয়, আজ নয়। আর এক রাউন্ড চা হবে না?

এগারো

সারা দুপুর ঘুমোতে পারেননি রামমোহন। এর মধ্যে আরও দু'বার রাঁধুনি বদল হয়েছে, এখন যে আছে, সে দু'বাড়িতে রান্না করে। ঠিকে ঝিদের মতন রান্নার লোকও যে এক সঙ্গে একাধিক বাড়িতে কাজ করতে পারে, সে সম্পর্কে রামমোহনের কোনো ধারণাই ছিল না। এ রমণীটি খুবই ব্যক্তিত্বময়ী, পুরনো বাংলা সিনেমার ঝগরুটে ছায়া দেবীর মতন চেহারা, আসে ঠিক ভোর ছ'টায়। সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে তার রান্নাবান্না শেষ, টেবিলে খাবার বেড়ে দিয়েই সে দৌড়োয় অন্য বাড়ির দিকে। সে বাড়িতে শুধু তিনজন বুড়ো-বুড়ি, অফিস যাত্রী কেউ নেই, তাই সেখানে বেশি বেলায় রান্না হলেও চলে।

দুই ছেলে ও এক মেয়ে দশটার আগেই খেয়ে দেয়ে অফিসে যায়। রামমোহনকেও সেই সঙ্গে খেয়ে নিতে হয়, নইলে দুপুরে তাঁর খাবার গরম করে দেবে কে? রান্নার রমণীটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বাড়িতে আর সবাই উপস্থিত, সুতরাং রামমোহন তার সঙ্গে ঝগড়া করারও সুযোগ পান না। বড় জোর এক একদিন নতুন কিছু পদ রান্নার জন্য বায়না ধরেন, এ রাঁধুনির তাতে আপত্তি নেই, চটপট করে দিতে পারে। তার রান্নার হাতটি যে অতি চমৎকার, তা রামমোহনও স্বীকার করতে বাধ্য।

এরপর তাঁর দুপুরটা কাটে কী করে?

রামমোহন কখনো বই পড়া অভ্যেস করেননি। মুন্নিটা গল্পের বইয়ের পোকা, তার ঘর থেকে দু'একটা বই এনে পড়বার চেষ্টা করেছেন, কিছুতেই মন বসাতে পারেননি।

রিটায়ার করার আগে ভাবতেন, ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে, মানুষ হচ্ছে, বড় চাকরি করবে, তিনি বাড়িতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আরাম উপভোগ করবেন। এই নাকি আরামের ছিরি? টাকা পয়সার অভাব নেই বটে, কিন্তু মনে যদি শান্তি না থাকে তাহলে গুচ্ছের টাকা দিয়েও আরাম কেনা যায় না।

সারা শরীরে সব সময় একটা অস্বস্তি। বুকে একবার ব্যথা হয়েছিল, সেই ভয়টাও আছে। তাঁর বয়েসী বিভিন্ন মানুষের মৃত্যু সংবাদ পান প্রায়ই। অফিসের দু'জন প্রাক্তন সহকর্মী চলে গেছে।

সে মৃত্যু যখন আসবে তো আসুক, তার আগে একজন যদি সঙ্গী না থাকে, তা হলেই জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে যায়। সরমা যদি থাকত। সরমার চলে যাবার অভাবটা বেশি বেশি করে বোধ করেন এখন। বুড়ো বয়েসে মানুষ কেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, তাও তিনি এখন বুঝতে পারেন, তাঁর নিজেরও মনে সে রকম একটা ইচ্ছে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে যায়।

খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে একটু বয়স্কা বিধবা পাত্রীর কথাও তো থাকে। তার বাল্যবন্ধু অবনীভূষণ মারা গেছে প্রায় দশ বছর আগে। তার বিধবা বউ লাবনি একা থাকে উল্টোডাঙায়, নিঃসন্তান, তাকে প্রস্তাব দিলে রাজি হবে না? মাঝে মাঝে লাবনির খোঁজ নিতে যান, সে শখ করে বস্তির ছেলে-মেয়েদের পড়ায়, লাবনিকে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয় না। ছেলে-মেয়েরা কি মানবে?

অথচ ছেলেমেয়েরা কেউ আর আপন নয়। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এক একদিন বাবার সঙ্গে একটা কথা বলারও সময় পায় না। তিনি টের পেয়েছেন, বড় ছেলে দিবাকর এ বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে উঠে যাবার কথা ভাবছে। মফস্বলে থাকার অনেক ঝামেলা, যাতায়াতে কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়, রোজ রোজ ট্রেন জার্নির ধকলও অসহ্য। দিবাকরের অফিসের কাজ বেড়েছে, এখন অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার, তাই শহরে থাকলে সুবিধে হবে। এই সবই বাজে যুক্তি!

আসল কথা হলো, শান্তা তার বাপের বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চায়। সে ভবানীপুরের মেয়ে, মফস্বলের জীবন তার প্রথম দিন থেকেই পছন্দ নয়, শ্বশুর বাড়ির চেয়ে বাপের বাড়ির দিকেই তার পুরোপুরি টান। আজকালকার ছেলেগুলোও হয়েছে ভেড়ুয়া, সব সময় বউয়ের মর্জি বুঝে চলে, দিবাকরেরও তো শালা-শালীদের সঙ্গেই বেশি দহরম মহরম।

নিজের বিয়েটা হয়তো সম্ভব নয়, রামমোহন এখন ছোট ছেলে চন্দনের বিয়ের কথা ভাবছেন। চন্দন কোনওদিন এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না, সে এলেমই তার নেই। ইংরিজি আর বাংলা, দুটো পত্রিকা রাখা হয় রোজ, তার মধ্যে ইংরিজি কাগজটা তো দিবাকরের দখলেই থাকে, সে বাথরুমেও আধঘণ্টা ধরে কাগজ পড়ে। বাংলা কাগজটা মুন্নি আর শান্তা ভাগাভাগি করে নেয়, ওরা অফিসে যাবার আগে রামমোহন কাগজে হাত ছোঁয়াতে পারেন না। তাঁর জন্য তো সারা দুপুর পড়ে আছে!

তিনি পাত্র-পাত্রীর পৃষ্ঠাতেই চোখ বুলোন আগে। পাত্রদের কথা পড়ে কোনও লাভ নেই, তবু পড়েন। মুন্নিটা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে এখন বিয়ে করবে না, খবরের কাগজ দেখে পাত্র বাছাই করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। রামমোহন মনে মনে জানেন, এ মেয়ের ওপর তাঁর জোর খাটবে না। তবু মাঝে মাঝে বলে ফেলেন। একদিন খাবার টেবিলে মুন্নি নির্লজ্জের মতন বলেছিল, বাবা, অন্তত তিনজন আমাকে বিয়ে করতে চায়, তোমার সঙ্গে তাদের আলাপও করিয়ে দিতে পারি। তোমরা যাকে ভাল পাত্র বল, সেই হিসেবে তিনজনকেই তোমার পছন্দ হবে। আমি চাইলে এক মাসের মধ্যে ওদের একজনের সঙ্গে বিয়ে সেরে ফেলতে পারি। কিন্তু আমার বিয়ে করার কোনও ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে নেই, বুঝলে।

রামমোহন ভাবেন, তাঁর বাপ-মায়ের আমলে কি কোনও মেয়ে তার বাবার মুখের ওপর এমন ভাবে কথা বলতে সাহস পেত? হুঁঃ একটা থাপ্পড় খেত না? অবশ্য তখন মেয়েরা তো এত লেখাপড়াও শিখত না। তাঁর নিজের স্ত্রী ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলেন। মেয়েরা যতদিন স্কুলে পড়ে, ততদিন থাকে বাড়ির মেয়ে, যে-ই স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে যায়, অমনি তাদের চোখ-মুখ, কথাবার্তা কেমন যেন বদলে যায়। বাবা হয়েও কলেজে-পড়া মেয়ের অবাধ্যপনা দেখেও গায়ে হাত তোলা যায় না। এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুন্নি তো আবার পি এইচ ডি করে ফেলেছে। রামমোহন অনুভব করেন, তিনি যেন মুন্নির সঙ্গে পিতৃ অধিকারে নেই, বড় জোর মেসোমশাই-পিসেমশাইয়ের মতন দূর সম্পর্কের কেউ।

পাত্র চাইয়ের চেয়ে পাত্রী চাইয়ের বিজ্ঞাপন অনেক কম। রামমোহন হিসেব করে দেখেছেন, মেয়ে পক্ষের আবেদন অন্তত তিনগুণ বেশি তো হবেই। তার মানে, এখনও কন্যাদায়। বাপ-মা বিয়ে না দিলে মেয়েরা অনূঢ়াই থেকে যাবে। পাত্রীদের মধ্যে অনেক 'উচ্চ শিক্ষিতা', 'প্রকৃত সুন্দরী', সরকারি গেজেটেড অফিসার এবং রান্নাও জানে। আর যারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, তারা 'গৃহকর্মে নিপুণা' কিংবা সঙ্গীতজ্ঞা হবেই। এত সব গুণী মেয়েরাও নিজে নিজে বিয়ে করতে পারে না। শুধু তাঁর মেয়েটাই এরকম ঠ্যাটা হলো কী করে? মুন্নিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়েও কোনও লাভ নেই, নিজে যথেষ্ট রোজগার করে, এক কথায় কোনও হস্টেলে চলে যাবে।

সরমা চলে যাবার পর সব ছেলেমেয়েরাই এ বাড়ির প্রতি উদা

অন্যায় হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন সরমা, এটা তার অন্যায়, ভারি অন্যায়!

রামমোহন একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে। তারই ফলাফল দেখে তিনি প্রায় হতবাক। একশো সাতচল্লিশটা উত্তর এসেছে, অনেকেই পাঠিয়েছে পাত্রীর রঙীন ছবি! একজন পাত্রের জন্য একশো সাতচল্লিশটা মেয়ে? দেশে কি ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে গেছে?

চিঠি আসে দুপুরবেলা। বাড়ির অন্য কেউ এ চিঠির কথা জানে না। রামমোহন সারা দুপুর ধরে কন্যাপক্ষের আবেদনগুলি খুঁটিয়ে পড়েন, ছবিগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে তুলনা করেন। কিছু কিছু ছবিতে যে মেয়েদের বয়েস লুকোবার চেষ্টা আছে, তাও তাঁর নজর এড়ায় না।

রামমোহন বেশ মজা পেয়ে গেছেন। আবার বিজ্ঞাপন দেন। আবার বন্যার জলের মতন চিঠি আর ছবি আসে। কোনও কোনও উত্তর পত্রে লেখা থাকে, 'প্রয়োজনে ছবি পাঠাইব', অর্থাৎ এই পার্টি গরিব। কেউ কেউ লেখে, সাক্ষাতে শর্তাদি আলোচনা। তার মানে পণ দিতেও রাজি আছে। পণ নিতে গেলে দিবাকর আর মুন্নি দু'জনেই আপত্তি জানাবে তিনি জানেন। তাঁর দুই ছেলেই বিনা পণে বিয়ে করেছে, লাভ ম্যারেজে পণের প্রশ্নই ওঠে না, আর পি এইচ ডি করা মেয়ে পণ প্রথার বিরোধিতা না করলে প্রগতিশীল হবে কী করে? পণ না নিলেও রামমোহন একটা ফ্রিজ অন্তত চাইবেন! বাড়িতে রয়েছে একটা মান্ধাতার আমলের ফ্রিজ, এটা বদলাবার কথা তুললেই দিবাকর বলে, কী দরকার, বেশ তো চলছে। ভেতরে কিছু রাখলে কি পচে যায়? ওলড ইজ গোলড!

বদলাবে কেন, এ বাড়ি ছেড়ে যাবারই তো মতলবে আছে তাঁর ছেলে। এ বাড়ির জন্য আর কিছু খরচ করবে না। অথচ আজকাল কত সব নতুন ধরনের ফ্রিজ বেরিয়েছে। টিভি'র বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, ডি ফ্রস্ট করতে হয় না, কী সুন্দর রং। আর হ্যাঁ। টিভি-টাও বদলান দরকার।

মুন্নি একেবারেই টিভি দেখে না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, তার চোখের সামনে কিংবা কোলের ওপর থাকে বই। শান্তা টিভি-টা নিজেদের শয়নকক্ষে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, দিবাকর অবশ্য আপত্তি করেছে, তা হলে বাবা দেখবেন কী করে? টিভি-টা রাখা আছে দোতলার খাবার ঘরে, রাত্তিরের দিকে দিবাকর আর শান্তা সিনেমা দেখতে বসে। শান্তা বাংলা সিনেমা দেখলেই মুখ বিকৃত করে, সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেল বদলে দেয়। ওদের পছন্দ ইংরিজি সিনেমা। এক একটা ইংরিজি সিনেমা পুত্র ও পুত্রবধূর কাছাকাছি বসে দেখতে রামমোহনের দারুণ অস্বস্তি হয়। কতক্ষণ ধরে চুমু, আর কথায় কথায় বিছানা। দিবাকররা সেই সময় বাবার উপস্থিতি গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু তিনি উঠে যান।

তা ছাড়া রামমোহনের পুরনো বাংলা সিনেমা দেখতেই বেশি ভাল লাগে। অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলি, নীতীশ মুখার্জি, সন্ধ্যা রানী, সুমিত্রা দেবী, মঞ্জু দে, এঁদের দেখলে তিনি রোমাঞ্চিত হন। ক'দিন আগে দুপুর বেলা দেখলেন 'ডাক্তার', পঙ্কজ মল্লিকের যেমন গান, তেমন অভিনয়। বহুদিন পর ফিলমটা দেখে চোখ আর বুক জুড়িয়ে গেল। নতুন নায়ক ছিল জ্যোতিপ্রকাশ, যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি স্মার্ট অভিনয়, এখনকার ছেলে-ছোকরাদের চেয়ে কত ভাল। রাত্তিরে খাবার টেবিলে রামমোহন অত্যুৎসাহে 'ডাক্তার' ছবিটার কথা বলতে গেলেন, পঙ্কজ মল্লিক যে একজন অভিনেতাও ছিলেন তা এরা জানেই না, জ্যোতিপ্রকাশের নামও শোনেনি। রামমোহন ছবিটার গল্প শোনালেন, তার মধ্যেই শান্তা আর মুন্নি এ বছর কেন ইলিশ মাছ উঠছে না, এই আলোচনায় মেতে উঠল।

রামমোহন নিজের ঘরে একটা নিজস্ব টিভি সেট চান, যাতে তিনি তাঁর ইচ্ছে মতন অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। সেটাও কি নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে কিনতে হবে! ছেলের বিয়েতে একটা ফ্রিজ আর একটা টিভি চাওয়া এমন কি ব্যাপার। তাঁর ছেলে তো ফ্যালনা নয়, স্বাস্থ্য ভাল, চাকরি করে। তিনি তো বাড়ি কিংবা গাড়ি চাইছেন না! একটু খুঁতো মেয়ে হলে নাকি তাও দেয়!

রামমোহনের কাছে এখন প্রায় শ'খানেক কুমারী মেয়ের ছবি। রোজই ছবিগুলো দেখেন, মাঝে মাঝে শাফল করেন তাসের মতন। চোখ বুজে একটা ছবি টেনে তোলেন, চিন্তা করেন, এর অভিভাবকদের সঙ্গেই পাকা কথা চালাবেন নাকি! বিয়ে তো অনেকটাই নিয়তির নির্বন্ধ।

দুটি পাত্রীকে তিনি প্রায় পছন্দ করে ফেলেছেন। চন্দনের সঙ্গে মানাবে। চন্দন ৫'১০'', আর এই দুটি মেয়েই ৫'২'', চন্দন মোটামুটি ফর্সা, এ মেয়ে দুটিও বেশি ফর্সা, তাতে এদের ছেলেমেয়ে ফর্সা হবে। লাবনির বাড়িতে গিয়ে তিনি একটি মেয়েকে কয়েকবার দেখেছেন, উর্মিলা নামের এই মেয়েটি বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছে, তার স্বামী ছিল মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, গ্রীসের কাছে এক জাহাজ-ডুবিতে সে বেচারি মারা গেছে। কী শান্ত আর সুন্দর এই মেয়েটি, উঁচু গলায় কথাই বলে না। উর্মিলার সবচেয়ে বড় গুণ, সে তার বাপ-মায়ের এক মাত্র মেয়ে। তাঁরা মেয়ের আবার বিয়ে দিতে চান। রামমোহনের মনে বিধবা মেয়ে সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ ভাব আছে, কিন্তু উর্মিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর ধারণা হয়েছে, এ মেয়ে কোনওদিন গুরুজনের অবাধ্য হবে না। ওর বাবার খুব চালু ওষুধের দোকান আছে শ্যামবাজারে। ঐ মেয়েই তো তার মালিক হবে। বিধবা হলেও, মাত্র এক বছর তো, তাও ওর হাজব্যান্ড বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে থেকেছে।

উর্মিলা সম্পর্কে তিনি যখন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছেন, তার পরেই অকস্মাৎ এই নিদারুণ কাণ্ড ঘটে গেল! আজ নিয়ে সতেরো দিন, চন্দন বাড়ি ফেরে না। তাঁর বড় দুটি ছেলে এত স্বাধীনচেতা হয়েও যা করেনি, কোনও দিন বাড়ির বাইরে রাত কাটায়নি, এই ম্যাদামারা, হাবলা ছেলেটা সেই কাণ্ড করে বসল?

রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় তিনি ঠিক করেছিলেন, চন্দনকে মন থেকে মুছে ফেলবেন। কিন্তু মনের ওপর কি জোর জবরদস্তি করা যায়? যত ভুলে থাকতে চাইছেন, ততই যেন সে তার মনটা বেশি অধিকার করে থাকছে। বাচ্চা বয়েসের চন্দন। তিন বছর বয়েস পর্যন্ত সে কথা বলতেই শেখেনি, ভয় হয়েছিল, ছেলেটা বোবা হবে নাকি, ডাক্তার দেখানোও হয়েছিল, তারপর হঠাৎ সে একদিন মা ডেকে উঠল। একবার স্কুল থেকে মার খেয়ে ফিরল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, তবু তার কোনও নালিশ নেই, কান্নাকাটি নেই। দু'দিন পর যে-ছেলেটা মেরেছিল, তার বাবা এসে ক্ষমা চেয়ে গেল।

আজ দুপুরে তাঁর একেবারে অসহ্য লাগছে, যেন শয্যাকন্টাকী হয়েছে, বিছানাতেও পিঠ রাখতে পারছেন না। একবার টিভি দেখার চেষ্টা করছেন একবার ফ্রিজ খুলে দেখছেন অকারণে। তারপর তালা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লেন।

বিকেলের চা-টা তাঁকে বাইরের দোকানে খেতে হয়। এ বাড়িতে দিন রাতের কাজের লোক টেঁকে না। শান্তা বলেছিল, চা বানিয়ে ফ্লাস্কে রেখে যাবে। কিন্তু ফ্লাস্কে বেশিক্ষণ চা থাকলে তাতে কেমন যেন গন্ধ লাগে রামমোহনের।

মোড়ের মাথাটার দোকানটাতে রোজই তিনি চা-বিস্কুট খেতে আসেন। মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। দোকানের মালিকের সঙ্গে বকবক করেন কিছুক্ষণ। লোকটি তাঁকে খাতির করে বড়বাবু বলে ডাকে। মাঝে মাঝেই সে বলে, বড়বাবু, আমাকে লাখ পাঁচেক টাকা জোগাড় করে দিন না, আপনার ছেলেরা এত ভাল চাকরি করে, টাকাটা পেলে আমি দোকানটা ঢেলে সাজাই, রেস্টুরেন্ট করে ফেলতে পারি।

এ প্রস্তাব রামমোহনের একেবারেই ভাল লাগে না। পাঁচ লাখ টাকা কি মুখের কথা! তিনি চায়ের দোকানে টাকা ঢালতে যাবেন কোন দুঃখে! এসব দোকান আজ আছে, কাল নেই। স্টেশনের কাছেই তো একটা পুরনো চায়ের দোকান উঠে গিয়ে জামা কাপড়ের দোকান হয়ে গেল। এখন ওসব দোকানই রমরম করে চলে।

আজও লোকটি সেই কথা তুলতে রামমোহন বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

মোটর গ্যারাজের পাশে বেলগাছটার তলায় কে একদিন একটা শিবলিঙ্গ পুঁতে ছিল। বছর দশেক আগের কথা, বাঙাল পাড়ার এক রিফিউজি পুরুত সেখানে বসত, এখন সেখানে রীতিমতন একটা মন্দির তৈরি হয়ে গেছে। মেঝেটা শ্বেত পাথরের, সব সময়ে ভিড় লেগেই আছে। রামমোহন কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়ালেন।

তাঁর মনে ভক্তি ভাব নেই। অনেকে এই ধরনের মন্দিরে এসে সময় কাটায়। রামমোহনের মনে হয়, এসবই বুজরুকি। নিজের চোখেই তো দেখলেন। এই দশ বছরের মধ্যে হতচ্ছাড়া পুরুতটা লোকজনদের ভুজুং ভাজুং দিয়ে কী করে মন্দিরটা বানিয়ে ফেললো!

তা ছাড়া, রামমোহনের বাবা ছিলেন বৈষ্ণব, এককালে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে প্রায়ই নাম-সঙ্কীর্তন হতো। তিনি কোনওদিন কোনও শিবের মন্দিরে যাননি। নবদ্বীপে শৈব আর বৈষ্ণবদের লড়াইয়ের সময় তিনি ছুটে যেতেন সেখানে। রামমোহনও শিবলিঙ্গটিকে মনে করেন অশ্লীল।

বাড়িতে ফিরে এসে দেখলেন, শ'খানেক মেয়েদের ছবি তাঁর বিছানার ওপর ছড়ানো। ছবিগুলোকে গুছিয়ে তুলে রাখতে হবে আলমারিতে, যাতে ছেলেরা কিছু জানতে না পারে। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর আবার রাগে গা জ্বলে গেল। তিনি পাঁচ-পাঁচটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এক জনেরও নিজের ইচ্ছে মতন বিয়ে দিতে পারবেন না! এ এমন যুগ যে মানুষ জন্মদাতাকেও পরোয়া করে না। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে থাকে, ছেলের হাতে বাবা খুন!

চন্দনও তো তাঁকে বলতে গেলে খুনই করেছে। জানাজানি হয়ে গেলে এরপর আর তিনি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবেন?

তিনি তরতর করে উঠে এলেন তিনতলায়।

এত দ্রুত তাঁর সিঁড়ি ভাঙা উচিত নয়। একবার বুকে ব্যথা হয়েছে, ডাক্তারের মতে, মাইল্ড অ্যাটাক, এরপর আরও হতে পারে, কোনটা ম্যাসিভ হবে, কেউ বলতে পারে না। মাঝে মাঝে তাঁর ব্যারাকপুরে শান্তিদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু একলা কোথাও যেতে ডাক্তারের নিষেধ আছে।

এই ঘরটা আগে ছিল মেজছেলের, এখন চন্দনের দখলে। বাড়ির সব থেকে ভাল ঘর। আলো-হাওয়া বেশি। জানলা খুললেই দেখা যায়, পাশের বাড়িতে কলা গাছের ঝাড়। একটা কলার কাঁদি প্রায় পেকে এসেছে, সবুজের ওপর হলুদ রং ধরেছে।

খাটের ওপর বিছানা পাতা, অনেকদিন কেউ শোয়নি বোঝা যায়। মাস বদলে গেছে। ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানো হয়নি। মেঝেতে টিকটিকির নাদি পড়ে আছে।

মেঝের ওপরেই স্তূপাকার বই আর টেবিলের ওপর ডাঁই হয়ে রয়েছে গান-বাজনার ক্যাসেট। রামমোহন দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন। এ ঘরের কোন্ কোন্ জিনিস তাঁর মেজ ছেলের আর কোনগুলি ছোট ছেলের, তা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হয় না। মেজ ছেলে তার অধিকাংশ জিনিসই নিয়ে গেছে, তার বউ নিজের দিদির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে চায় না। একটু খটাখটি শুরু হতে গিয়েছিল, ওদের আর কলকাতা ফিরে আসারই ইচ্ছে নেই। কানপুর থেকে বদলি হয়ে গেছে ব্যাঙ্গালোরে। ইন্ডিয়ার মধ্যে সেটাই নাকি এখন স্বর্গ। সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

ওরা খাট-বিছানা রেখে গেছে। বড় মিউজিক সিস্টেমটাও নেয়নি। চন্দন দিনরাত গান শোনে। ক্যাসেটগুলো তারই কেনা। একটা ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও, এটাও নতুন। আর বইগুলো?

একটা বই তিনি তুলে নিলেন। বইটার নাম 'নীলবসনা সুন্দরী'। নাম দেখে মনে হয়, অসভ্য ধরনের হতে পারে। বেশি বয়েস পর্যন্ত বিয়ে না করলে তো এই-ই হয়, অসভ্য বই পড়ে, খারাপ ছবি দেখে। এক দিন তিনি মুন্নিকে বলেছিলেন, তার ছোড়দা খুঁজে খুঁজে এমন সব পুরনো লেখকদের বই কিনে আনে, যে-সব লেখকদের নাম এখন অনেকেই জানে না। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রলাল বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর এইসব। মুন্নি দু'একখানা এই ধরনের বই পড়তে নিয়ে দেখেছে, পাঁচ-দশ পাতার বেশি এগোনো যায় না, এমনই বিদঘুটে ভাষা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রামমোহন বলতে লাগলেন, না, না, না। চন্দন নামে আমার কোনও ছেলে নেই। কোনওদিন ছিল না। এ বাড়ি থেকে তার সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। এ ঘর তার মেজো ছেলের, পাকাপাকি আর কখনও থাকতে না আসুক, বেড়াতে তো আসবে মাঝে মাঝে, নাতি হয়েছে, তাকে দেখাতেও আনবে না?

হাতের 'নীলবসনা সুন্দরী' বইটার দিকে তাকাতেই তাঁর রোখ চাপতে লাগল। তিনি গলির দিকের জানলাটা খুলে বইটা ছুঁড়ে ফেলেদিলেন। বেশ কিছু ইংরিজি পত্র পত্রিকাও আছে, তার ওপরেরটাতেই আধা-ন্যাংটো মেয়ের ছবি। গোছা করে পত্রিকাগুলো ফেলেদিলেন রাস্তায়। এই ক্যাসেটগুলোই বা থাকবে কেন? ঝলমগুলোও ছুঁড়তে লাগলেন, তাঁর নেশা লেগে গেল, সব ফেলে দেবেন, সব।

বিকেল হয়ে গেছে। এখন গলিপথও জনশূন্য থাকে না। আস্তে আস্তে ভিড় জমতে লাগল। প্রথমে লোকেরা ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। ওপর থেকে অনবরত বই পড়ছে, ক্যাসেট পড়ছে রাস্তায়, একি কোনও বাঁদরের কীর্তি? কিংবা পাগল? কয়েকজন চেঁচিয়ে সেই মর্মে প্রশ্নও করল, কিন্তু রামমোহনের কোনও উত্তর নেই। তিনি ফেলেই যাচ্ছেন। একটু পরেই, ঝড়ের সময় গাছের ফল কুড়োবার জন্য যেমন ছেলেমেয়েদের যেমন হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, সেই রকম ভাবেই লোকে বই-ক্যাসেট তুলে নিতে লাগল। বইয়ের বদলে ক্যাসেটের জন্যই কাড়াকাড়ি বেশি। কারণ ক্যাসেটের কিছু না কিছু দাম আছে, অনেকের কাছে বইয়ের কোনও দাম নেই।

মুন্নিই সবচেয়ে আগে অফিস থেকে ফেরে। সাইকেল রিক্সা থেকে নেমে সে দেখল, তাদের বাড়ির সামনে মচ্ছব লেগে গেছে। ক্যাসেট পড়ছে এখনও, প্রায় শ'খানেক ক্যাসেট লোকের হাতে হাতে, এর সঙ্গে আবার জামা-প্যান্ট-গেঞ্জিও পড়তে শুরু করেছে।

মুন্নি দৌড়ে উঠে এল তিনতলায়। রামমোহনের হাত চেপে ধরে বলল, বাবা, এ কী করছো?

রামমোহন ধমকে উঠে বললেন, ছাড়, ছাড় আমাকে। হারামজাদা, কুলাঙ্গারের কোনও চিহ্ন আমি রাখব না!

মুন্নি বলল, কেন, কী হয়েছে?

রামমোহন এবার হিংস্রভাবে তাকিয়ে বললেন, কেন কী হয়েছে? তুই জানিস না? ন্যাকা সাজছিস? ভেবেছিলি আমার কাছ থেকে লুকোবি?

বাবা, সে রকম কিছু, মানে, এখনও ঠিক খবরটা, নিশ্চয়ই ভুল খবর, বাজে খবর...

চুপ! তোর ছোড়দা বেশ্যা বিয়ে করেছে। ও আর আমাদের কেউ না। ওর নামও উচ্চারণ করবি না। কেউ যদি কিছু বলতে আসে, সোজা জবাব দিবি, ও হাবা ছেলেটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিল, এখন চলে গেছে, আপদ গেছে!

ছোট রেডিওটা ফেলে দেবার জন্য রামমোহন হাতে তুললেন।

রামমোহন যে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেমেয়েদের কথা শোনেন, তা তারা জানে না। এমনকি ওরা যখন দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, তখন তিনি নিঃশব্দে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তিনি গৃহকর্তা, কোনও কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকবে কেন?

গত মাসের শেষ শনিবারে চন্দন হঠাৎ দিবাকরের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। এরকম আগে কখনও সে আসেনি।

দিবাকর বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার রে, চন্দন! বোস বোস। তোর অফিসে কিছু গোলমাল হয়েছে?

চন্দন বলেছিল, না। অফিসে কিছু হয়নি। আমি তোমাকে অন্য একটা কথা বলতে এসেছি।

দিবাকরের নিজস্ব একটা চেম্বার আছে, সেখানে প্রচুর কম্পানি ল, ইনকাম ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়ের বই, ফাইলপত্তর। শনিবার ছুটির পরেও তাকে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়। তবু সে বুঝে নিয়েছে, গুরুতর কোনও কারণ না থাকলে তার ছোটভাইটি এভাবে আসবে না।

চোখ থেকে চশমা খুলে দিবাকর জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে বল?

চন্দন বলল, দাদা, আমি বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

দিবাকরের বিস্ময় তো আরও বাড়বেই। জীবনের একরকম একটা গুরুতর ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যে চন্দনের আছে, সেটাই অবিশ্বাস্য মনে হয় তার কাছে।

বিয়ে করবি? কাকে?

একটি মেয়েকে।

মেয়েকে তো বটেই। পুরুষ মানুষ কি কোনও ছেলেকে বিয়ে করে? মেয়েটি কে, তোর চেনা?

হ্যাঁ।

কী করে চেনা হলো? মানে, কতদিন ধরে চিনিস?

এই কিছুদিন।

বাবাকে বলেছিস? বাবা তোর জন্য উঠে পড়ে পাত্রী খুঁজছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, অনেক চিঠি আর ছবি এসেছে, শান্তা মুন্নি জানে। বাবা অবশ্য ওদের কিছু বলেননি। তুই সোজা গিয়ে বল

যেতে গেলে বাবা রেগে যাবেন ঠিকই, ঠিক আছে। সে আমরা ম্যানেজ করে নেব। মেয়েটি যদি ভাল হয়—

আমাকে কয়েকজন বলল, আমাদের বাড়ির লোকের মতামত নিলে ভাল হয়। তাই তোমার কাছে এসেছি। দাদা, তুমি মেয়েটিকে একবার দেখবে?

হ্যাঁ, দেখবো না কেন? একটা দিন ঠিক কর। তোর বউদিকেও নিয়ে যাবো। এসব ব্যাপারে মেয়েদের মতামতটাই আসল।

তুমি আজ যেতে পারো না?

আজই? কেন, এত গরজ কিসের? বিয়ে কি এত সাত তাড়াতাড়ি হয়? অনেক কিছু দেখে শুনে, বুঝে নিতে হয়।

ওরা বলল, আজই যদি তুমি একবার—

ওরা মানে কারা? কন্যাপক্ষ?

উঃ, হ্যাঁ।

কন্যেপক্ষ যা বলবে, তাই-ই শুনতে হবে? প্রথম প্রথম কন্যেপক্ষকে একটু টাইটে রাখতে হয়। বিয়ের বাজারে পাত্রপক্ষের কথাই শেষ কথা। হাজার হাজার মেয়ে মুখিয়ে আছে, তাদের বিয়ে হবে কি হবে না, তা পাত্রপক্ষের শুধু হ্যাঁ কিংবা না বলার ওপর নির্ভর করছে।

তুমি যখন বিয়ে করেছিলে—

শান্তাকে আমি বিয়ের আগে পাঁচ বছর ধরে চিনি। ওদের বাড়িতে গেছি। ওর খুড়তুতো ভাই-বোনদের আমি পড়াতুম না? তুই যার কথা বলছিস, তার বাবা কী করে? ফ্যামিলিটা কী রকম?

জানি না।

জানিস না?

দাদা, তুমি তা হলে আজ যেতে পারবে না?

তুই কী বলছিস চন্দন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হুট করে এসে বললি, একজনকে বিয়ে করবি। আজই তাকে দেখতে যেতে হবে। এর মানে কী?

আমি তা হলে যাই?

দাঁড়া।

প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে রইল দিবাকর। কৌতূহলে তার বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে।

তার দৃঢ় ধারণা হল, তার সরল, সাদাসিধে ভাইটা পাল্লায় পড়েছে কোনও কুহকিনীর। কিংবা কোনও পার্টি যেমন তেমন একটা মেয়েকে গছাচ্ছে, এটা আটকাতেই হবে।

সে বলল, আমার স্যাটারডে ক্লাবে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিকেলে, ঠিক আছে, সেটা পরে গেলেও চলবে। চল দেখে আসি। থাকে কোথায় মেয়েটি?

বেশি দূরে নয়, উত্তর কলকাতায়।

দিবাকরকে অফিসের গাড়ি শিয়ালদা স্টেশন থেকে নিয়ে আসে। পৌঁছে দেয়। ইচ্ছে করলে একটু বেশিক্ষণও গাড়িটা রাখা যায়।

দিবাকরের অফিস মিশন রো-তে, অফিসের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরল।

দিবাকর চুরুট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই এর মধ্যে বোকার মতন কিছু একটা করে বসিসনি তো?

না।

চন্দনের কাছ থেকে বেশি উত্তর আশা করা যাবে না জেনে দিবাকর নিজেই কথা বলে চলল। প্রধানত বাবার বিষয়ে। বয়েস যত বাড়ছে, ততই খিটখিটে হয়ে যাচ্ছেন বাবা। ব্লাড প্রেশারটা নিয়মিত চেক করানো দরকার। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লোনলি হতে বাধ্য, বিশেষত বিপত্নীক হলে, জোর করে ছেলেমেয়েদের কাছে টেনে রাখার চেষ্টা করে কোনও লাভ হয় না। ছেলেমেয়েদের তো নিজস্ব জীবন তৈরি হয়ে যাবেই। রাগারাগি করলে ফল আরও খারাপ হয়। মুন্নি বিয়ে করেনি বলে বাবা এমনিতেই খুব অশান্তিতে আছেন। মেয়েদের একটা বয়েসের মধ্যে বিয়ে করতে হবেই। এসব ওল্ড ফ্যাশনড আইডিয়া, মুন্নির যখন ইচ্ছে হবে, কিংবা যদি বিয়ে নাও করতে চায়, তাতেই বা এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে চন্দন বলল, এখানে থামতে হবে।

ড্রাইভার গাড়ি থামালো রাস্তার এক পাশে।

দিবাকর দু'দিকে জানলা দিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করল, এখানে বড় রাস্তার ওপরে বাড়ি?

চন্দন ডান দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, না, এর মধ্যে এখানে গাড়িটাড়ি যায় না।

দিবাকর বলল, এই রাস্তায় মানে? ধ্যাৎ! এখানে কেউ থাকে নাকি? অবশ্য পেছন দিকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটে...আমার এক কলেজের বন্ধু ওখানে থাকত, কয়েকবার এসেছি তার বাড়িতে, ও রাস্তার কিছু কিছু বাড়ির দরজায় বোর্ডে লেখা আছে, ইহা গৃহস্থ বাড়ি।

চন্দন বলল, না, এই রাস্তাতেই, একটুখানি গিয়েই ডান দিকে, একটা হলদে রঙের বাড়ি।

এটা কোন্ পাড়া, তুই জানিস?

হ্যাঁ, জানি।

তুই যে মেয়েটির কথা বলছিস, সে এ-পাড়ায় থাকে?

হ্যাঁ।

কী করে?

থাকে। কাজ করে।

কাজ করে, মানে, প্রস্টিটিউট?

সেক্স-ওয়ার্কার!

দিবাকর চড়াৎ করে একটা থাপ্পড় কষালো চন্দনের গালে।

কৌতূহল এখন রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধে। তার সারা শরীর কাঁপছে।

সে চন্দনের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, হারামজাদা, বেয়াদপির একটা সীমা আছে। তুই আমাকে প্রস কোয়ার্টার দেখাতে নিয়ে এসেছিস? তোর এতটা অধঃপতন হয়েছে এর মধ্যে আমরা টেরও পাইনি।

চন্দন শান্ত ভাবে বলল, দাদা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তা হলে নেমে যাই?

দিবাকর হুংকার দিয়ে বলল, নামবি মানে? তোর ঘাড় ধরে নিয়ে যাবো। তোর মতলব কী বল আগে। তুই কেন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিস? আমি একটা বেশ্যার ঘরে যাবো? তুই একটা বেশ্যাকে বিয়ে করতে চাস?

হ্যাঁ। তাকে আমার ভাল লেগেছে।

ভাল লেগেছে বলে একটা বেশ্যাকে বিয়ে করতে হবে? আমাদের ফ্যামিলির একটা মান সম্মান নেই? শান্তাদের বাড়ির লোকজন জানতে পারলে সেখানে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো? তোর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। তোকে কে এই কুপথে এনেছে?

কেউ আনেনি। আমি নিজেই এসেছি।

দিবাকর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। রাগের মধ্যেও তার একটা অপমান বোধ হচ্ছে যে তার অফিসের ড্রাইভার সব শুনছে। কালকেই অফিসে কানাকানি হয়ে যাবে যে কদিন বাদেই যার ম্যানেজার হবার কথা, তার আপন ভাই বেশ্যার দাস হয়েছে।

সে ড্রাইভারকে বলল, ইদ্রিস, গাড়িতে স্টার্ট দাও।

চন্দনকে সে বলল, আগে বাড়িতে চল, তারপর তোর মাথা থেকে কী করে ভূত তাড়াতে হয় আমি দেখাচ্ছি।

চন্দন বলল, দাদা, আমি নামবো, আমার এখানে কাজ আছে।

গাড়ির দরজা খুলে ফেললো সে।

এর মধ্যেই কয়েকজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরের এই নাটক দেখছে।

দিবাকর হাত বাড়িয়ে চন্দনকে ধরতে গিয়েও থেমে গেল। এ ভাবে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না। ঠিক আছে, বাড়িতে তো ফিরবেই কোনও-না-কোনও সময়ে।

চন্দন গাড়ি থেকে নেমে তার বড় ভাইয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।

দিবাকরের সঙ্গে চন্দনের সেই শেষ দেখা। চন্দন আর বাড়ি ফেরেনি।

দিবাকর প্রথমে ঠিক করেছিল, বাড়ির কারুকেই সে নিজে থেকে কিছু জানাবে না। ঘটনা কোন্ দিকে গড়ায়, দেখা যাক।

কিন্তু নিজের শয্যাসঙ্গিনীর কাছে এত বড় একটা ব্যাপার গোপন রাখা খুবই শক্ত ব্যাপার। প্রথম দুদিন চন্দন বাড়ি না ফেরার উদ্বেগ, তার অফিসে খোঁজ করেও কিছু জানা যায়নি, অফিসেও সে যাচ্ছে না, থানায় ও হাসপাতালেও খবর নেওয়া হচ্ছে। অন্যদের তুলনায় দিবাকর যেন কম চিন্তিত।

রাত্তিরে চুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম মেখে, শুধু একটা ঢোলা পোশাক পরে বিছানায় শুতে এসে শান্তা বলল, চন্দনের যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে, ওর পকেটে কি আইডেনটিটি কার্ড বা এমন কিছু থাকে, যাতে ওর নাম-ঠিকানা জানা যাবে?

দিবাকর ফ্যাকাসে গলায় বলল, চন্দনের অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, এই শনিবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

তারপর দিবাকর পুরোটাই বলে গেল সংলাপ সমেত একক অভিনয়ের মতন।

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো শান্তা। তারপর বলল, ওই যে চন্দন বলেছে, যে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, সেটা কিন্তু মোটেই বোকার মতন কথা নয়। ছেলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয় না ঠিকই। চন্দন বোঝাতে চেয়েছিল, সে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তাকে তার পছন্দ হয়েছে, মেয়েটিও নিশ্চয়ই রাজি। এটাই তো যথেষ্ট। মেয়েটি কোথায় থাকে, তার আত্মীয় স্বজন কারা, সে কী কাজ করে, তা নিয়ে অন্যদের মাথা ঘামাবার দরকার কী?

দিবাকর বলল, তার মানে, তুমি এই ব্যাপারটা সাপোর্ট করো?

শান্তা বলল, না, সে সাহস আমার নেই। আমি শুধু বলছি যুক্তির কথা!

দিবাকর বলল, মানুষকে চেনা কত শক্ত। আমার ভাই, ওকে জন্ম থেকে দেখছি, ওর স্বভাবের নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত জানি, কিন্তু সেদিন এমনভাবে কথা বলছিল, যেন অন্য মানুষ। প্রত্যেকটি কথা বলছিল শান্তভাবে, অথচ কী তার জোর, এমন আত্মবিশ্বাস, আগে কখনও দেখিনি। জানো, আমার এই ভাইটাকে আমি ভালবাসি, আমি রেগে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু এমন কষ্ট হচ্ছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলুম, ও একটা দারুণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে।

শান্তাও যথাসময়ে, অর্থাৎ পরের দিন সন্ধেবেলাতেই মুন্নিকে সব জানিয়ে দিল। কারণ মুন্নিও তো ভয় পাচ্ছে যে চন্দনের বুঝি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

মুন্নির প্রতিক্রিয়াও দিবাকরের মতনই। একজন যৌনকর্মীকে জেনে শুনে বিয়ে করাটা যত না নৈতিকতার বিরোধী, তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক, বিশেষত চন্দনের পক্ষে। সে এটা সামলাতে পারবে না। এবং চন্দন নিশ্চিত স্বেচ্ছায় নয়, কারুর পাল্লায় পড়ে পাকেচক্রে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

ওরা কেউই বাবাকে জানাতে চায়নি। রামমোহনের হার্ট ভালো না, যদি এই ধাক্কায় খারাপ কিছু হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে বলতে হবে, চন্দন এর মধ্যে ফিরে আসতেও পারে।

ছোট রেডিওটা হাতে নিয়ে, রামমোহন বললেন, বাজে খবর? দেখ গিয়ে সমস্ত কাগজে উঠে গেছে, টিভি-তে বলছে, রামমোহন সে সরকারের ছেলে একটা বাজারের বেশ্যাকে বিয়ে করেছে। আমার মাথা কাটা যাচ্ছে লোকের সামনে। ও মরলো না কেন, সেই যে একবার টাইফয়েড হয়েছিল, তখন যদি মরে যেত...

রামমোহন হাঁপাতে লাগলেন।

মুন্নি ভয় পেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, বাবা।

রামমোহন জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন রেডিওটা।

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, এই, এই, ওটা কেউ নেবেন না। ওটা আমাদের। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—

রামমোহন যা বললেন, তার এক বর্ণও সত্যি নয়। খবরের কাগজে বা টিভি-তে চন্দনের কথা এক বর্ণও প্রচারিত হয়নি। তার মতন একজন সাধারণ মানুষের সে সংবাদ-যোগ্যতাই নেই। জঙ্গলে সন্ত্রাস,পার্টিতে পার্টিতে খুনোখুনি, কাশ্মীরে নির্বাচন, হাসপাতালে শিশু মৃত্যু, এইসব নিয়ে মিডিয়াগুলি এত ব্যস্ত যে একজন কে অন্যরকম একটা বিয়ে করলো, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে কেন? তা ছাড়া এটা এমন কিছু অভিনব ঘটনাও নয়।

তবু কী করে যেন ঘটনাটা ছড়িয়েছে, জেনেছে অনেকেই। ট্রেনে মুন্নিকে একজন অল্প চেনা শিক্ষিকা ভুরু অনেকটা তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার তো মেজদা নাকি... ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে বলো তো?

চোদ্দ

নৈহাটির অনঙ্গমোহন বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন লেখিকা শান্তিশিখা মজুমদার।

তাঁর আসল নাম ছিল শান্তিময়ী, ভাগলপুরের মেয়ে হিসেবে ও নাম মানিয়ে গেলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লেখিকা হিসেবে শান্তিময়ী চলে না। জ্যাঠাইমা, পিসিমা মার্কা মনে হতে পারে। শুধু শান্তি রাখারও অসুবিধে আছে, অনেক পুরুষের নামও শান্তি হয়। নামটা বদলাবার জন্য অন্য অনেক কিছু ভাবা হয়েছিল, শান্তিলতা? তাও পুরনো ধরনের। শান্তিদ্যুতি, বেশি খটখটে। শান্তিসুধা? ধ্যাৎ। শান্তিশিখাটাই শুনতে ভালো।

প্রথমে তাঁকে সভাপতি করার কথা ভেবেছিলেন স্কুল কমিটি। কার্ড ছাপতে দেবার সময় প্রধান শিক্ষিকার মনে হল, একজন মহিলা কি সভাপতি হতে পারে? সভাপত্নী হওয়া উচিত না? কিন্তু সভাপত্নী তো এ যাবৎ কেউ ব্যবহার করেনি। ওসব ঝঞ্ঝাটে যাবার দরকার কী, পাড়ার উকিলবাবু হোন সভাপতি, প্রধান অতিথি হিসেবে শান্তিশিখা মজুমদারই প্রাইজ ট্রাইজ দেবেন।

ওঁর ছোট মেয়ে মুকুলিকা এম এ পাশ করার পর এই স্কুলে পড়িয়েছে কয়েক মাস, এখন সে কাজ পেয়েছে জঙ্গিপুর কলেজে, থাকেও সেখানে। মায়ের সঙ্গে ছোট্ট বয়েসে সভা-সমিতিতে যেত মুকুলিকা, অনেকদিন—তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে ব্যারাকপুরে থাকেও না। পুরনো পরিবারের সূত্রে মুকুলিকাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে, প্রায় এক মাস পরে মায়ের সঙ্গে তার এখানেই দেখা।

স্বাস্থ্যের দ্যুতিতে ঝলমল করছে মুকুলিকা। তার রূপের কিছুটা অভাব পুষিয়ে গেছে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে। পরেছেও একটা রামধনু-রঙা শাড়ি। একটা অলিখিত নিয়ম আছে, স্কুল-কলেজের শিক্ষিকাদের নম্র ধরনের, অনুজ্জ্বল পোশাক পরতে হবে। পুরুষ শিক্ষকরা কিছুকাল আগেও ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন, এখন প্যান্ট-শার্ট চালু হয়ে গেছে বটে, তবে চক্রাবক্রা জামার ব্যবহার শুরু হয়নি।

দেখা যাচ্ছে, মুকুলিকা ওসব নিয়ম টিয়ম মানে না।

এখানে নানা বয়েসের, নানা ধরনের বালিকা, যুবতী, রমণীরা রয়েছে বটে, কিন্তু শান্তি একটু দূরে বসা নিজের মেয়ের দিকেই আড় চোখে দেখছেন মাঝে মাঝে। নিঃসন্দেহে মুকুলিকাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়া। এ যে তাঁর মেয়ে। এটাই যেন শান্তির মাঝে মাঝে বিশ্বাস হচ্ছে না। যেন সে কোনও উপন্যাসের চরিত্র হতে চায়, তাকে ঘিরে রয়েছে একটা কাহিনীর আবরণ। জঙ্গিপুরে একলা বাড়ি ভাড়া করে থাকে, ছেলে বন্ধু টন্ধু আছে কিনা কে জানে। সমর্থ পুরুষরা এ মেয়েকে তো কামনা করবেই, তাদের কী করে ফেরায় মুকুলিকা?

যাঃ, নিজের মেয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় নাকি? এত কৌতূহল থাকাও ভাল নয়।

শান্তি ভাবতে চেষ্টা করেন, এ মেয়েকে তিনি পেটে ধরেছেন, জন্ম দিয়েছেন, তারপর কয়েক বছর ওর গু-মুত পরিষ্কার করেছেন, সাত-আট বছর বয়েস পর্যন্ত ইজের পরে দৌড়োদৌড়ি করত? সে এখন পূর্ণ বিকশিত শতদল।

মুকুলিকা একটু ঝুঁকে কথা বলছে। সভাপতির সঙ্গে, মধ্যবয়স্ক উকিল বাবুটির মুখে যে বিগলিত হাসি, তা দেখে শান্তিশিখা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ওই হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে লুব্ধতা, তিনি মনে মনে মুকুলিকার শরীর লেহন করছেন, কেন না উকিলবাবুটি যখন প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করছেন, তখন তাঁর মুখে হাসির চিহ্নমাত্র থাকে না। এই হেড মিস্ট্রেসের কি উকিলবাবু সম্পর্কে দুর্বলতা আছে? ভদ্রলোকের অনেক টাকা, উইডোয়ার। এরা গল্পের চরিত্র হতে পারে না? কী মুশকিল, তিনি সব কিছুর মধ্যেই গল্পের আভাস খুঁজে পান।

পুরস্কার বিতরণীর পর মেয়েদের নৃত্যনাট্য আছে, শান্তিশিখা শেষ পর্যন্ত থাকবেন না। স্কুল কর্তৃপক্ষ সারাদিনের জন্য একটা ট্যাক্সি ঠিক

করে রেখেছেন, তিনি সেই ট্যাক্সিতে ফিরবেন।

তিনি উঠে দাঁড়াবার পর বাঁ পাশে চেয়ে দেখলেন, মুকুলিকা তখনও কথা বলে যাচ্ছে উকিলবাবুর সঙ্গে, তার ওঠার লক্ষণ নেই।

শান্তিশিখা জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, তুই থাকবি না যাবি?

মুকুলিকা বলল, আমি তো জঙ্গিপুরে ফিরব।

চল, তোকে স্টেশান পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল মুকুলিকা। যেন তার এক্ষুনি ওঠার ইচ্ছে নেই, তবু সে উঠল।

ট্যাক্সিটা ছাড়ার পর মা জিজ্ঞেস করলেন, মুকুল, তুই আজকাল ব্যারাকপুরে থাকতে চাস না কেন রে?

মেয়ে বললো, প্রত্যেক সপ্তাহে আসতে হবে? মাসে একবার তো আসি।

শনিবার এসে রবিবার বিকেলেই চলে যাস। তাও তো আগের মাসের শনিবারটা তুই অনুশীলাদের বাড়িতে কাটিয়ে গেলি। বাড়ির ওপর তোর আর টান নেই। তোর চেয়ে বরং তোর দিদি বেশি আসে।

দিদি কলকাতায় থাকে। আসাটা সোজা। আমাকে অনেক ঘুর পথে আসতে হয়।

জঙ্গিপুরে কেমন সংসার পেতেছিস, একবার গিয়ে দেখেও আসতে বললি না তো আমাকে।

মা, তুমি সব সময় লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকো। এখন তোমার লেখালেখি অনেক বেড়ে গেছে, বাড়িতে গেলেও তো কথা বলার সময় পাও না। জঙ্গিপুরে তো তুমি যেদিন খুশি আসতে পারো। তার জন্য কি তোমাকে ফরমালি নেমন্তন্ন করতে হবে?

তোর দিদি মাঝে মাঝে জোর করে আমায় নিয়ে যায়।

কলকাতায় তোমার নিজেরও কাজ থাকে। পাবলিশারদের সঙ্গে দেখা করা টরা, তাছাড়া সভা সমিতি...

আমার একটু বেশি নাম ডাক হচ্ছে, সেটা বুঝি তুই পছন্দ করিস না?

অদ্ভুত কথা বলছো মা! পছন্দ হবে না কেন? নিজের মা বিখ্যাত হলে কার না ভালো লাগে? তবে, একটা কথা বলব? তোমার আরও অনেক বেশি সুনাম হতো, যদি তুমি বাবাকে ডিভোর্স করতে।

অ্যাঁ? এটা কি বললি?

ঠিকই বলেছি। তুমি তো ইচ্ছে করলেই এখন আলাদা থাকতে পারো। তুমি বলেছিলে, তুমি বিয়ে ব্যাপারটাই কোনওদিন পছন্দ করোনি। এখন তো তোমার আর কোনও দায় দায়িত্ব নেই। তোমার নিজের যথেষ্ট রোজগার আছে, তুমি এখন অনায়াসেই স্বাধীনভাবে থাকতে পারো। দেখো না, মহাশ্বেতা দেবী, কতদিন ধরে, স্বাধীনভাবে থাকেন, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন। তুমিও তো কিছু কিছু সোসাল ওয়ার্কের সঙ্গে এখন যুক্ত নও কিন্তু কোনওদিন মহাশ্বেতা দেবীর মতন সেন্ট পারসেন্ট ইনভলভড্ হতে পারবে না, সংসারের গিন্নি সেজে থেকে ওসব হয় না।

ভারি তো সংসার। তোরা দুই বোনই দূরে চলে গেছিস, এখন তো দুটি মাত্র প্রাণী, তোর বাবা আর আমি।

তবু সেটা একটা সংসার, তোমার পরিচয় তুমি নারায়ণ মজুমদারের বউ। যে নারায়ণ মজুমদারকে তুমি কোনওদিন ভালবাসতে পারোনি। তোমার হাতে শাঁখা, লোহা, মাথায় সিঁদুর। এগুলো কী? হিপোক্রিসি না? তোমার লেখার সঙ্গে একদম মেলে না।

অল্প বয়েসে আমার বিয়ে দিয়েছিল, তখন থেকে শাঁখা, এখন এমন আঁট হয়ে গেছে যে খুলতেই পারি না। এক এক সময় ভাবি ভেঙে ফেলবো। কিন্তু মনের মধ্যে যেটা আঁট হয়ে আছে, সেটাকে ভাঙি কী করে? আমাদের সময় সব হিন্দু মেয়েকেই বিয়ের পর হাতে লোহা পরতে হতো। কোন্ শাস্ত্রে এটা আছে তা জানি না। দাসী-বাঁদীর চিহ্ন তা জানি। এখনো অনেক মেয়ের হাতে থাকে, কিন্তু সোনা দিয়ে মুড়ে রাখে, মনে হয় সোনার চুড়ি। আর সিঁদুর কোথায় দেখলি? আজ সিঁদুর লাগিয়েছি? এখন প্রায়ই লাগাই না, ওতে লেড পয়জনিং হয়।

মাঝে মাঝে লাগাও, সেটাই বা কেন? লিখবে একরকম আর নিজের জীবনে সেটা মানবে না।

শোন, শোন, খুকি শোন। লেখকরা প্রধানত অবজারভার, অন্যদের চেয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেশি। যা দেখবে, নিজের জীবনেও তার প্রতিফলন আনতে গেলে তো বহুরূপী হতে হয়। না খেতে পাওয়া মানুষের কথা লিখতে গেলে কি আমাকেও দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে হবে? হিজড়েদের কথা লিখতে গেলে আমি হিজড়ে হবো? অ্যাঁ? একদিন এই সব কথা একসময় অনেকে বলেছে বটে, তারা ডুবেছে। অবজারভেশন, অবজারভেশন ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করে প্রতিভা। সৃষ্টির কেমিস্ট্রিটা অন্যরকম, এত সোজা নয়।

মা, আমার স্টেশান এসে গেছে, আমাকে নামতে হবে।

দাঁড়া, দাঁড়া, একটু দাঁড়া। তোর বাবাকে ছেড়ে যাবার কথা বলছিলি, হ্যাঁ, একথা ঠিক, আমি কোনোদিনই ওঁকে ঠিক নিজের মানুষ হিসেবে নিতে পারিনি, ছেড়ে গেলে, যাওয়া উচিত ছিল আমার যৌবন বয়েসে। এখন ইট্স টু লেট, আমাদের দু'জনের পক্ষেই। বয়েস হলে বুঝবি, প্রেম-ভালবাসার চেয়েও আর একটা স্ট্রং ফিলিং আছে। যার নাম মায়া! এত বছর এক সঙ্গে আছি, প্রেম থাকলেও এতদিনে শুকিয়ে যেত, কুঁচকে যেন গায়ের চামড়ার মতন, তার বদলে ডালপালা মেলে জড়িয়ে ধরেছে মায়া। মানুষটা আমার চেয়েও বুড়ো হয়ে গেছে, কিছুই মনে রাখতে পারে না, আমি রোজ সকালবেলা সব ওষুধগুলো খাওয়াই, তার এক ঘণ্টা পরে এসে কাঁচুমাচু ভাবে বলে, শান্তু, আজ ওষুধ খাওয়া হয়নি, ব্লাড প্রেশারের ওষুধ বাদ পড়ে গেলে মহা বিপদ হতে পারে, এক একদিন শেষ রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, খাটের ওপর চুপ করে বসে আছে, ঘাড়টা নিচু, দেখে এমন মায়া হয়, এখন ওকে ছেড়ে কোথায় যাবো? হয়তো আমি যতটা ভালো লিখতে পারতাম, তার থেকে একটু কম ভালো লেখা হবে, যতটা নাম হতে পারতো, তার চেয়ে একটু কম নাম হবে, তবু কি একজন অসহায় মানুষকে ছেড়ে চলে যাওয়া যায়?

মা, তাহলে আমি যাই, পরের সপ্তাহে আসবো।

চল, আমি তোকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

তুমি আবার কষ্ট করে কেন যাবে? পরের ট্রেন কখন আসবে জানি না। তাছাড়া, তোমার ট্যাক্সি।

তাতে কী হয়েছে?

তিনি ট্যাক্সিচালকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা করবে বাবা? আমার মেয়েকে একটু তুলে আসি, বেচারি একা একা যাবে।

শাড়ি টাড়ি সামলে ট্যাক্সি থেকে নামলেন শান্তিশিখা।

কয়েক পা হেঁটেই তিনি বলে উঠলেন, উঃ! এতক্ষণ বসে থেকে কোমরে সেই ফিক ব্যথাটা... আমার হাতটা একটু ধর না খুকি! নাকি লোকজনের সামনে মায়ের হাত ধরে হাঁটতে তোর মানে লাগবে? মাত্র বাইশ-চব্বিশ বছর আগেও তুই এইসব ভিড়ের জায়গায় আমার হাত ধরে সিটিয়ে থাকতিস!

মায়ের হাত ধরে মেয়ে মৃদু বকুনি দিয়ে বলল, তুমি আজকাল বড্ড বেশি কথা বলছো মা!

প্ল্যাটফর্মে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ একটা কোনো ট্রেন আসছে শিগগিরই। এইসব নিত্যযাত্রীরা কেউ অবশ্য প্রখ্যাত লেখিকা শান্তিশিখা মজুমদারকে চিনতেই পারলো না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন তোর সঙ্গে ভালো করে গল্প হয় না। তোকে কি আজ ফিরতেই হবে, মুকুল?

মুকুলিকা সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ।

শান্তিশিখা মেয়ের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে বললেন, তুই আজ এত সেজেছিস কেন রে? খুব সুন্দর মানিয়েছে। এই ইস্কুলের মিটিংটার জন্য?

মুকুলিকা অভক্তির মুখভঙ্গি করে বলল, ইয়্যাঃ! স্কুলের ফাংশানে কি দিদিমণিরা সাজে? জঙ্গিপুরের গঙ্গার ধারে একটা আঁকড়া বকুল গাছ আছে, এই সময় খুব ফুল ফোটে। আজ আবার পূর্ণিমা। সন্ধের পর সেই বকুল গাছতলায় একজন আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি যতক্ষণ না পৌঁছোই, যদি সারা রাত কেটেও যায়, তবু সে দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়েই থাকবে।

শান্তিশিখা এক গাল হেসে বললেন, এটা তুই এই মাত্র বানালি, তাই না?

আজকাল কেউ বকুল গাছের নিচে দাঁড়ায় না, রেস্টুরেন্টে দেখা করে, আমি জানি না ভেবেছিস? কেউ আমার সামনে বাজে কবিত্ব করলেই আমি ঠিক ধরে ফেলি!

মুকুলিকাও হেসে ফেলল।

কমকম করে একটা ট্রেন আসছে। এই থামলো বলে।

মা বললেন, যেতেই হবে, আজ না গেলে চলে না?

মুকুলিকা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, তোমাকে কতবার বলবো, আমার বিশেষ কাজ আছে। কাল সকালেই... তুমি বড্ড এগিয়ে পড়ো, ট্রেন ওঠার সময় তুমি যদি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্না শুরু করো, আমার খুব খারাপ লাগবে। এইখান থেকে এইখানে যাবে, আর সামনের সপ্তাহে তো আসছিই।

শান্তিশিখা আর একটাও কথা না বলে উল্টো দিকে ফিরে হাঁটতে লাগলেন। কোমরের ব্যথায় আর চিহ্ন নেই। ব্যক্তিত্বময়ী জননেত্রীর মতন তিনি গট গট করে হাঁটতে লাগলেন চিবুক উঁচু করে।

বাইরে এসে দেখলেন, ট্যাক্সিটা আছে ঠিকই, কিন্তু তার চালককে দেখা যাচ্ছে না।

অনেক সভা সমিতিতে যাওয়ার জন্যই শান্তিশিখার এই অভিজ্ঞতা আছে। ড্রাইভারশ্রেণী অদৃশ্যপ্রবণ। মিটিং শেষ হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরতে হবে, উদ্যোক্তাদের গাড়িও তৈরি আছে, কিন্তু ড্রাইভার বেপাত্তা। বেশ কয়েকবার আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

স্কুল কমিটি শান্তিশিখাকে অনেক ফুল ও কিছু উপহার দিয়েছে। একটা শাল ও একটি বাঁধানো মানপত্র, সেগুলি ট্যাক্সির মধ্যেই রয়ে গেছে, ড্রাইভার হয়তো চা খেতে গেছে, কিন্তু সামনের চায়ের দোকানটিতে সে নেই।

দরজাগুলো লক করা, অগত্যা শান্তিশিখাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে!

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন এসে তাঁর দু'চোখ টিপে ধরলো।

এ যেন বাল্যকাল ফিরে আসা। এ যেন ভাগলপুর। এ যেন শাখা-লোহা-সিঁদুর বর্জিত এক জীবন। এখানে তো তাঁর সঙ্গে এরকমভাবে খেলা করার কেউ নেই।

তিনি বললেন, কে রে? দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে নাম বলতে হবে না, দেখি আমি পারি কি না!

যে হাত তাঁর চোখ টিপে ধরেছে, সেই হাতের ওপর নিজের হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বলে উঠলেন খুকি?

হ্যাঁ, সত্যিই মুকুলিকা।

সে বলল, মা, তুমি বুঝলে কী করে?

শান্তিশিখা বললেন, কী জানি, কী করে বুঝলুম। কিন্তু বুঝেছি তো ঠিকই। তুই ফিরে এলি বড়? এটা বুঝি তোর ট্রেন নয়!

মুকুলিকা বললেন, হ্যাঁ, এ ট্রেনেও যাওয়া যেত। কিন্তু তুমি এমন করুণ মুখ করে তাকালে, তারপর কি যাওয়া যায়?

যাঃ, মোটেই করুণ মুখ করিনি।

ট্যাক্সি ড্রাইভার কোথায় গেল?

কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না।

তা বলে তোমাকে এইভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবে? মা, তোমার এখনো পার্সোনালিটি শো করলো না! তুমি অন্য একটা গাড়ি ডেকে চলে যেতে পারতে না।

এই ট্যাক্সিতে যে তাঁর উপহারের শাল ও মানপত্র আছে, সে কথা তিনি আর বললেন না। যদিও এই শালটা এমন কিছু নয়, একটু শীত পড়লেই সবাই শাল দেয়, আর এরকম হাতে লেখা মানপত্র তিনি অনেক পেয়েছেন, তা কেউ কিছু দিলে অবহেলা করা যায় না।

তিনি হাল্কাভাবে বললেন, এসে পড়বে, এসে পড়বে। কিন্তু তুই ফিরে এলি যে? বকুল গাছের নীচে যার দাঁড়াবার কথা, তার কী হবে?

সে থাক না, সারা রাত দাঁড়িয়ে!

যদি বকুল গাছের বদলে সে কোনো রেস্টুরেন্টে যায়, সেটাও তো এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে! তাহলে!

তাহলে সে দোকানের সামনের সিঁড়িতে বসে থাকবে। ওসব বাদ দাও, মা, তোমাকে একটা কথা জানাবার জন্যই আমি ফিরে এলাম। আমি জঙ্গিপুরে আর বেশিদিন নেই। ওসব ছোট জায়গায় আমাকে কেউ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। আমি জে এন ইউ-তে আপ্লাই করেছিলাম, চান্স পেয়ে গেছি! সামনের মাসেই দিল্লি চলে যাচ্ছি।

তোর বাবা শুনলে কত খুশি হবে। এরপর বিলেত বা আমেরিকায় যাবি। আমি ঠিক জানি। তোকে এখানে ধরে রাখা যাবে না। বাড়িতে গিয়ে কথা হবে, তুই এক কাজ করতো খুকি, ওই চায়ের দোকান থেকে

দু' গেলাশ চা নিয়ে আয়।

কাচের গেলাশে চা খুবই গরম। ট্যাক্সির বনেটে গেলাশটা রেখে শান্তিশিখা জিজ্ঞেস করলেন, তুই চন্দনের খবর শুনেছিস?

মুকুলিকা ভুরু কুঁচকে বলল, চন্দন? কে চন্দন?

বাঃ, আমাদের রামমোহনদার ছোট ছেলে, চন্দনকে তোর মনে নেই।

ও! সেই চন্দন? আমি আরও দু'জন চন্দনকে চিনি। তার কী হয়েছে!

সেই চন্দন বিয়ে করেছে!

মা, তোমার কী ভীমরতি হয়েছে? বিয়ে করাটা একটা খবর, রাম-শ্যাম-যদু-মধু সব ছেলেরাই তো বিয়ে করে!

এই তো তোদের নিয়ে মুশকিল! তোরা ভুলে যাস যে আমি একটা ক্রিয়েটিভ পার্সন। একটা সাধারণ বিয়ের ঘটনা হলে কি আমি বলতুম? এই বিয়েটা একটা বলবার মতনই ঘটনা।

তা হলে অসাধারণ ব্যাপারটা কি শুনি?

তুই তো জানিস, দুর্বার মহিলা সংগ্রাম কমিটির মেয়েরা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমি ওদের কিছু কিছু স্লোগান লিখে দিই। তোর দেবিকাকে মনে আছে? তুই দেখেছিস দু' একবার আমাদের বাড়িতে। এরকম স্পিরিটেড মেয়েদের আমার খুব ভাল লাগে। সে কথায় কথায় বলল, সোনাগাছিতে এই রিসেন্টলি একটা বিয়ে হয়েছে, তাই নিয়ে খুব সাড়া জেগেছে ওখানে, আর সেই বিয়ের নায়ক হচ্ছে আমাদের চন্দন!

চন্দন? একটা হার্লটকে বিয়ে করেছে?

এসব পুরনো ইংরিজি এখন আর চলে না মুকুল। এখন আমরা বলি, সেক্স ওয়ার্কার। বাংলায় যৌনকর্মী। যে-কোনও পেশায় শ্রমিকদের মতন ওদেরও ট্রেড ইউনিয়ন রাইট নিয়ে লড়া হচ্ছে। আমরা লেবার কমিশনারের কাছে—

কাট ইট আউট! বক্তৃতা শুরু করো না মা। চন্দন নিজের ডিসিশানে বিয়ে করতে চেয়েছে, সাউন্ডস ভেরি ফানি। বাট হোয়াট দা হেল হি হ্যাড টু ম্যারি আ সো কলড সেক্স ওয়ার্কার?

সো কলড বলছিস কেন রে। তার পছন্দ হয়েছে। মানে সে ওই সব মেয়েদের অবস্থা ফিল করেছে, ওদের সাফারিংটা শেয়ার করতে চায়।

দেখ মা, কারুর সাফারিং শেয়ার করতে হলেই তাকে বিয়ে করতে হবে কেন? মনে কর, একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখে কারুর সাহায্য করতে ইচ্ছে হল, অমনি সে তাকে বিয়ে করবে? দিস ইজ অ্যাবনরমাল!

তুই কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে তুলনা করছিস? এই সব মেয়েদের তুই অতি কষ্টের আর পরিশ্রমের শ্রমজীবী বলে মানতে চাস না?

ঠিক আছে, ধরো একটা অন্ধ মেয়ে, তাকে বিয়ে করাটাও তো একটা ফলস মহত্ত্ব দেখাবার ব্যাপার।

আবার ভুল তুলনা দিচ্ছিস। এরা অন্ধ কেন হবে? পারফেক্টলি নর্মাল। বাধ্য হয়ে এই জীবিকা নিয়েছে বাঁচার জন্য। অনেক পুরুষকেও তো বাঁচার জন্য কত রকম বিপজ্জনক জীবিকা নিতে হয়। হাওড়া ব্রিজ রিপেয়ার করতে গিয়ে একটা লোক যে সেদিন উঁচু থেকে পড়ে মারা গেল।

বিধবারা তো নর্মাল? দেশে কত বিধবা আছে, তারা অনেকে অনেক কষ্ট আর অপমানও সহ্য করে। সে রকম কোনও বিধবাকে যদি কেউ বিয়ে করে, সহানুভূতি দেখাবার জন্য, আসলে সেটা দয়া দেখানো, সারা জীবন সেটা একটা বোঝা হয়ে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দায়-টায় থাকলে তা কখনও স্বাভাবিক হয় না।

কোনও বিধবাকে বুঝি কেউ ভালোবেসে বিয়ে করতে পারে না? এ রকম তো কতই হয়। সেখানে দয়ার প্রশ্ন নেই। চন্দনের এই বিয়ের ঘটনার সব কথা শুনে দু'টো ব্যাপার আমার খুব আশ্চর্য লেগেছে। রিয়েলি স্ট্রাইকিং। চন্দন ও পাড়ার একটি মেয়ের কাছে প্রথম গিয়েছিল, তারপর আর—

চন্দন সেক্স মেটাতে ও পাড়ার মেয়েদের কাছে গিয়েছিল, নিজে থেকে, আমি এখনো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

আর, শোন না সবটা। মেয়েদের নয়, শুধু একটি মেয়ের কাছে গেছে, আর কোনও মেয়ের দিকে সে তাকায়নি, কারুর ঘরে যায়নি। অথচ এ মেয়েটি যে তেমন কিছু আহামরি, তাও নয়। তারপর মেয়েটি অসুস্থ হলো। খুবই অসুস্থ, চোখে আর মাথায় ইনজুরি হয়েছিল, তা থেকে সেপটিক হয়ে যায়, তখন সে অফ ডিউটি যাকে বলে, তার কাছ থেকে পুরুষ মানুষের কিছুই পাবার নেই, তবু চন্দন দিনের পর দিন তার কাছে গিয়ে বসে থেকেছে। এই যে বিয়ের ব্যাপারটা, তাও চন্দন নিজে থেকে কিছু বলেনি। তার এতখানি টান দেখে দেবিকা এমনি কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি ওকে বিয়ে করতে চান? চন্দন দু'এক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে, উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আই লিড যাকে বলে, উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, বিয়ে করা যেতে পারে! বিয়ের মতন এরকম একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত, তাও খুব স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নয়, কোনও মানুষ এত তাড়াতাড়ি রাজি হতে পারে? এত ক্যাজুয়ালি।

তুমি যা-ই বলো মা, ও ছেলেটাকে বরাবরই আমার অ্যাবনরমাল মনে হয়েছে।

অনেক গ্রেটনেসের মধ্যেও অ্যাবনরমালিটি থাকে। রাশি-রাশি নরমাল মানুষ দেখতে দেখতে আমাদের চোখ পচে গেছে!

তুমি এর মধ্যে গ্রেটনেস খুঁজে পেলে? আমার তো মনে হচ্ছে, এটা এক ধরনের অবসেশান!

আর একটা ব্যাপার শোন! মেয়েটা প্রথমে বিয়েতে রাজি হয়নি। কিন্তু চন্দনকে দিনের পর দিন তার পাশে বসে থাকতে দেখে, তার জেনুইন ব্যাকুলতা, তার নির্লোভ মুখটা দেখে শেষ পর্যন্ত মেনে নিল। তারপর দুর্বারের মেয়েরা রেজিস্ট্রি বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের ঠিক আগের দিন, সেই মেয়েটি, সবাই তাকে রাধা বলে ডাকে, আসলে তার নাম হাসু, সে দেবিকাকে বললো, দিদি, আমি যে মুসলমান, তা কি লুকিয়ে রাখবো? যদি পরে জেনে যায়? দেবিকা বলল, লুকিয়ে রাখা হবে কেন? আগে থেকে সব জানাই তো ভাল। আমি চন্দনবাবুকে আজই জানাচ্ছি। তারপর একথা শুনে তিনি যদি রাজি না হন, হবেন না! ওঁকে তো কেউ জোর করতে যাচ্ছে না। চন্দন একটা চায়ের দোকানে বসেছিল, দেবিকা তখনই গিয়ে ওকে জানাল। তারপর কী হল বলতো? দেবিকা আমাকে এইভাবে বর্ণনা করেছে, বলল, মাসিমা, আমি যখন চন্দনবাবুকে বললুম, রাধার কিন্তু আসল নাম হাসু, ও মুসলমান, তা শুনে চন্দনবাবু শুধু বললেন, হুঁ। আমি ভাবলুম, উনি বোধহয় শুনতে পাননি। তাই আবার বললুম, রাধা মুর্শিদাবাদের মেয়ে, মুসলমান বাড়িতে ওর জন্ম, ওর নাম হাসু। এবার চন্দনবাবু আমার দিকে এমন অবাক ভাবে তাকালেন, যেন আমি ওকে কালা ভাবছি, তাই এক কথা দু'বার বলছি। তারপর বললেন, কাল কি আমার পক্ষ থেকে কোনও সাক্ষী আনতে হবে? এরকম তুই কখনও শুনেছিস?

হিন্দু-মুসলমানে বুঝি বিয়ে হয়নি আগে কখনও!

হবে না কেন, হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবে হয় কি? এখনও অনেক সোস্যাল স্টিগমা আছে। অনেক সংস্কার আছে। পাড়া প্রতিবেশীরা ঝামেলা করে, দু' সম্প্রদায় থেকেই অনেক রকম বাধা আছে। এই তো তহমিনা নামে একটি মেয়ে একটি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করার জন্য বি এড কলেজে ভর্তি হতে পারেনি দশ বছর ধরে। অনেক জায়গায় মেয়েটাকে জোর করে বেঁধে রাখে, শাস্তি দেয়। ছেলেটা খুন হয়ে যায়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে, আটঘাট বেঁধে এগোতে হয়। আর এই চন্দন, ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করল না। হিন্দু না মুসলমান, যেন তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে, মেয়েটি রাজি হয়েছে, তারপর তার ধর্ম, তার বংশ পরিচয়, তার পরিবেশ, এ সবই তুচ্ছ! এতখানি সাহস।

এটা কি সাহস, না কোনো কিছু তলিয়ে দেখার অক্ষমতা।

তুই এক সময় চন্দনকে ভালোবাসতি, তাই না?

তুমি পাগল হয়েছো? ভালোবাসবার মতন কী যোগ্যতা আছে ওর? আমি তো কিছু দেখিনি কখনো।

মানুষ বুঝি অযোগ্যকেও ভালোবাসে না। সবসময় মাপকাঠিতে সমান সমান হতে হবে?

তা হতে পারে, অযোগ্যকেও অনেক সময় ভালোবাসা যায়। মায়েরা যেমন দুর্বল সন্তানটিকেই বেশি ভালোবাসে। সে ভালোবাসার মধ্যে অনেকটাই মিশে থাকে করুণা। না, ওর প্রতি আমার সে রকমও কখনও হয়নি। তবে ওর সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল। খুব পিকিউলিয়ার মনে হতো। এক এক সময় সন্দেহ হতো, ছেলেটা হোমোসেক্সুয়াল নাকি? এখন তো বুঝছি, তা নয়।

ব্যারাকপুরে পৌঁছেও মায়ের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হল মুকুলিকার। তাই পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল বেশ। ধড়মড় করে উঠেই সে তৈরি হতে লাগল। তাকে জঙ্গিপুরে ফিরতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

শান্তিশিখা বললেন, তুই আজকের দিনটাও থেকে যা না! আমি তাহলে প্রমিস করছি, আজ সারাদিন এক লাইনও লিখবো না, প্রুফ দেখবো না। তোকে রান্না করে খাওয়াবো। তুই আমার পাশে বসে কুটনো কুটে দিবি। তোর বাবা তো অম্বলের ভয়ে সেদ্ধ মেদ্ধ ছাড়া কিছু খেতেই চায় না। এখন আর রান্না করে সুখ নেই।

নারায়ণ বললেন, ঠিক আছে আজ যেন গড়গড়ে করে মাংস রাঁধো। আর ঝিঙে পোস্ত। যা হয় হোক, একদিন না হয় খেয়েই দেখি। খুকির সঙ্গে বসে অনেকদিন খাইনি।

মুকুলিকা বলল, আর লোভ দেখিও না মা। আজ না গেলে চাকরি থাকবে না।

কিছুতেই থাকতে রাজি হলো না সে। যাবার সময় বাবার গা ছুঁয়ে বলে গেল, ওষুধ খেতে ভুলে যেও না। আমি দিল্লি গেলে তোমরা বেড়াতে আসবে।

স্টেশনে গিয়েও সে আবার মন বদলে ফেললো। জঙ্গিপুরের দিকের ট্রেনে না উঠে চলে এলো কলকাতায়। তারপর হাওড়ার বাস ধরলো। চন্দন একটা ওষুধের কারখানায় কাজ করে, তার নাম ও এলাকাটা সে মোটামুটি জানে।

যেতে যেতে মুকুলিকা নিজেকেই প্রশ্ন করল, কেন সে যাচ্ছে? চন্দনকে কংগ্রাচুলেশান্স জানাতে। তার ভারি দায় পড়েছে! কারণটা সে ঠিক জানে না, তবু বুকের মধ্যে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। একবার শুধু চন্দনকে দেখতে চায়?

মাঝ পথে নেমে পড়বে ভেবেও নামা হল না।

কারখানাটা খুঁজে পেয়েও সেখানে খোঁজ করে সে জানল, বেশ কিছুদিন ধরে অফিসে আসছে না চন্দন। সে কোথায় থাকে, তাও বলতে পারলো না কেউ।

পনেরো

প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে অফিসে এসেছে চন্দন। লম্বা হলঘরটা দিয়ে সে হেঁটে আসছে, তার সহকর্মীরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে তাকে। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলল না।

অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আর চারজন এসে গেছে, চন্দনের চেয়ারটা খালি। টেবিলের ওপর একটা গেলাসে বহুদিনের পুরনো জল।

অন্য চারজন হঠাৎ যেন কাজে বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে, কেউ তাকাচ্ছে না চন্দনের দিকে। চন্দন একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

তারপর একটা ফাইল টেনে নিয়ে বলল, সত্যেনদা, এ মাসের স্যালারি বিল তৈরি হয়ে গেছে?

সত্যেন মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, চন্দন, বড় সাহেব তোকে জয়েন করতে দিতে বারণ করে গেছেন। তুই ছুটির দরখাস্ত না করে এতদিন আসিসনি?

প্রীতম বলল, বুড়ো তোমার ওপর খেপচুরিয়াস হয়ে আছে। প্রথম প্রথম বার বার তোর খোঁজ করছিল, এখন আর কিছু বলে না। আমাদের সঙ্গেও ভাল করে কথা বলে না।

সত্যেন বলল, তুই এটা কী করলি ইডিয়েট? এরকম কেউ করে?

চন্দন বলল, এখন দরখাস্ত করলে হবে না? আমার তো ছুটি পাওনা আছে।

সত্যেন বলল, ঝটপট লিখে ফ্যাল। তারপর দ্যাখ কী হয়। এটা প্রাইভেট কম্পানি, মালিকের যা মর্জি হবে...। তোকে জয়েন করতে বারণ করে দিয়ে গেছেন। এখন তোকে কাজ করতে হবে না।

চন্দন প্রথমে ছুটির দরখাস্তের মুশাবিদা করে তারপর সেটা ভাল করে লিখল অন্য কাগজে। সেটা সত্যেনের দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে বলল, আমি নিয়ে কী করবো? সুপারিনটেন্ডেন্টকে দিয়েও কোনও লাভ হবে না। খোদ বড় সাহেবের হাতে তুই নিজে দিয়ে আয়। অসুখের কথা লিখেছিস তো? পরে একটা ফলস ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে দিবি।

চন্দন অসুখের কথা লেখেনি।

পরমেশের চেম্বারের বাইরে বসা আর্দালিকে দিয়ে প্রথমে খবর পাঠাতে হল। তারপর ভেতরে এসে বলল, স্যার, আমি কিছুদিন আসতে পারিনি, আমার ছুটির অ্যাপ্লিকেশন।

পরমেশ বেশ কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন চন্দনের দিকে। তার মুখখানিতে গভীর বিষাদ মাখা। এই ছেলেটিকে তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন। একটু পরেই তার মুখের চেহারা বদলে গেল। যেন এখন তিনি চোখের সামনে দেখছেন একটি কুৎসিত, ক্লেদাক্ত মূর্তি।

তিনি বললেন, তুমি বসবে না, চেয়ারে বসবে না, দাঁড়িয়ে থাকো।

মালিক নিজের মুখে না বললে কোনও কর্মচারি তাঁর সামনের চেয়ারে বসে না নিজে থেকে। পরমেশের এ নির্দেশ দেবার দরকার ছিল না।

টেবিলের ওপর রাখা চন্দনের ছুটির দরখাস্তটি পড়ে দেখা দূরে থাক, তিনি হাত দিয়ে ছুঁলেনও না। একটা স্কেল দিয়ে টেনে টেনে এনে ফেলে দিলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।

তারপর তিনি বেল বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে বললেন, ইউনিয়নের লিডার, চণ্ডীবাবু দীপকবাবু আর সুধাকান্তবাবুকে ডেকে আনো। বলবে, খুব জরুরি, এক্ষুনি আসতে হবে।

চন্দন দাঁড়িয়েই রইল। পরমেশ একেবারে ঝুঁকে পড়ে পড়তে লাগলেন, একটা ফাইল। চন্দনের উপস্থিতি তিনি গ্রাহ্যই করলেন না।

ইউনিয়নের তিন নেতার মধ্যে সুধাকান্ত এখনও অফিসে পৌঁছননি। অন্য দুজনের সঙ্গে চলে এলো সত্যেন।

পরমেশ প্রথমেই সত্যেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এসেছেন? আপনাকে তো ডাকিনি।

সত্যেন বলল, স্যার, গত সপ্তাহের মিটিং-এ আমি ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছি।

পরমেশ বলল, ও, ঠিক আছে। আপনারা বসুন।

এবার বোঝা গেল, পরমেশ কেন আগের নির্দেশটি দিয়েছিলেন। 'আপনারা'-র মধ্যে চন্দন বাদ।

এই কারখানা ও অফিসের প্রবীণতম কর্মীটির চেয়েও পরমেশ অন্তত কুড়ি বছরের বড়। এতদিন তিনি প্রায় সবাইকেই তুমি বলতেন, কাউকে তুই। সম্প্রতি ইউনিয়ন থেকে একটি স্মারকলিপিতে তাঁকে জানানো হয়েছে যে এক অফিসে কর্মের ভিত্তিতে ছোট বড় সবাই সমান। কর্মীদের তুমি বা তুই বলে সম্বোধন করার অধিকার মালিকের থাকতে পারে না। তাতে মনে হবে যে কর্মীরা যেন তাঁর ভৃত্য। অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পর্কে, কোনও কর্মী যদি তুমি-তুই শুনতে রাজি থাকে, সেটা আলাদা কথা।

পরমেশ সেটা মেনে নিয়েছেন, আগে যাদের তুই বলতেন, তাদেরও এখন আপনি বলা শুরু করেছেন। যদিও মাঝে মাঝেই ভুল হয়ে যায়।

গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আপনাদের ডেকেছি এই জন্য যে, এই ছেলেটিকে আমি বরখাস্ত করতে চাই। আজ থেকেই ও আর চেয়ারে বসতে পারবে না। নিয়ম অনুযায়ী ওকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে। তারপর থেকে ও আর এই অফিসের প্রেমিসেসের মধ্যেই ঢুকতে পারবে না।

ইউনিয়নের তিন ব্যক্তির কাছে এই ঘোষণা একেবারে আকস্মিক নয়, আগে থেকেই কিছুটা আঁচ পেয়েছিল। তবু একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল।

তারপর চণ্ডীবাবু বলল, কেন স্যার, এই বাজারে একটি ছেলের চাকরি খেতে চাইছেন কেন?

পরমেশ বললেন, বিনা নোটিশে কুড়িদিন অফিসে আসেনি, আমাদের কাজের গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। প্রস নেগলিজেন্স।

সত্যেন বলল, স্যার, ওর কিন্তু ছুটি পাওনা আছে অনেক।

পরমেশ বললেন, সে ছুটি পাওনা থাকুক বা, না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়েও যদি ডুব দিয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমার অযোগ্য।

অন্য নেতাটি গম্ভীর ধরনের। সে বলল, প্রথমবারের মতন ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলেই তো হয়। ছাঁটাই করা চলবে না।

পরমেশ তেড়ে উঠে বললেন, চলবে কি চলবে না, তা তু-তু-মি, আপনি বলার কে হে? এটা আমার কারখানা। আমি যদি কাউকে অযোগ্য মনে করি, তাকে তাড়াতে পারবো না।

সেই নেতাটি বলল, না, আপনি তা পারেন না।

সত্যেন বলল, এই, দীপক, তুমি একটু চুপ করো। স্যার, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? এই চন্দন যে সরকারের সার্ভিস রেকর্ড খুব ভাল।

গত পাঁচ বছরে মাত্র দু-তিন দিন ছুটি নিয়েছে, অ্যাটেনডেন্স খুব পাংকচুয়াল। শুধু এই একবারই, সে জন্য আমাদের মনে হয়, আপনি একটু লিনিয়েন্ট হতে পারেন।

তা বলে টানা কুড়ি দিন অ্যাবসেন্ট? একটা খবরও দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।

কোনও কারণে অসুবিধে থাকতে পারে।

কী এমন অসুবিধে যাতে একটা চিঠিও লেখা যায় না।

বাবা কিংবা মায়ের খুব অসুখ হলে, মানে তখন দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তখন চিঠি লেখার কথাও মনে থাকে না।

পরমেশ উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত নাড়তে নাড়তে উত্তেজিত ভাবে বললেন, মোটেই ওর বাবা, মায়ের অসুখ হয়নি। ও কী কারণে এতদিন আসেনি, আপনারা জানেন? আমি জানি, ও একটা বেশ্যাকে বিয়ে করেছে। বেশ্যা, বেশ্যা, বেশ্যা!

অফিসের কোনও কর্মচারীরই এ-ঘটনা জানতে বাকি নেই।

তাদেরই তো একজন চুপি চুপি পরমেশকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে গেছে।

পরমেশ এবার চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, গেট আউট! ইউ ফিল্‌দি ক্রিচার। আমি আর কোনদিন ওর মুখ দেখতে চাই না। ওকে আমি তাড়াবোই।

চন্দন মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দীপক উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত চেপে ধরে বলল দাঁড়ান! যাবেন না।

তারপর পরমেশের দিকে তাকিয়ে তেজের সঙ্গে বলল, আপনি আমাদের একজন কলিগকে এরকম ইনসাল্ট করতে পারেন না। ইউ হ্যাভ নো রাইট। আপনি ওকে তাড়াবেন বললেই আমরা মেনে নেব?

পরমেশ বললেন, কী করবেন, স্ট্রাইক? আমি তা হলে তালা ঝুলিয়ে লক আউট করে দেব।

সত্যেন দুহাত ছড়িয়ে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনই এসব এক্সট্রিম স্টেপ নেবার কথা বলার কোনও মানে হয়? আমরা তো ঠাণ্ডা মাথায় ডিসকাশ করতে পারি। আমার মনে হয়, চন্দন গিয়ে বাইরে বসুক। আমরা আলোচনা করে কী ডিসিশন নেওয়া হবে, সেটা ওকে জানিয়ে দেব পরে।

পরমেশ বললেন, বাইরে চলে যাক। কিন্তু বসতে পারবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে।

দীপক বলল, কেন দাঁড়িয়ে থাকবে? ওর এখনও চাকরি যায়নি। ও বসবে, আলবাৎ বসবে।

পরমেশ বললেন, বসবে? বেশ। আর্দালিকে বলে দিচ্ছি, একটা চেয়ার দিয়ে গেটের কাছে বসিয়ে রাখবে। ওর ডিপার্টমেন্টে যেতে পারবে না। যদি কিছু জরুরি কাগজপত্র হাতিয়ে নেয়।

দীপক বলল, আপনি ওর নামে বাজে অ্যালিগেশন দিচ্ছেন? ও নিজের চেয়ারে, নিজের ডিপার্টমেন্টেই বসবে।

সত্যেন বলল, আঃ হাঃ হা, কোথায় কোন্ চেয়ারে বসবে, সেটাই কি বড় কথা? আমরা আসল ব্যাপারটা থেকেই সরে যাচ্ছি।

আর্দালি এসে চন্দনকে বাইরে নিয়ে গেল।

চণ্ডীবাবু বলল, স্যার, বিনা ইনটিমেশনে ছুটি নেওয়াটা একটা অপরাধ হতে পারে, এর সঙ্গে অফিসের চাকরির কী সম্পর্ক আছে? এখানকার কর্মীদের পারসোনাল ব্যাপারে, পারিবারিক ব্যাপারে আপনি মাঝে মাঝে মাথা গলাতে চান আমরা লক্ষ করেছি, কিন্তু আপনার কোনও রাইট নেই।

পরমেশ বলল, রাইট নেই?

তারপরই থেমে গিয়ে পকেট থেকে একটা সরবিট্রেটের শিশি বার করে, একটা ছোট গুলি জিভের তলায় দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর শান্তভাবে বললেন, এটা খুব গুরুতর ব্যাপার, তোমরা বুঝতে পারছো না? ইউ আর অল মাই চিলড্রেন। এক হিসেবে তোমাদের মরাল গার্জেনও বটে। সরকারি অফিসে চাকরি পেতে গেলে গেজেটেড অফিসার ব্যাঙ্কের কারুর কাছ থেকে মরাল ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেট লাগে। ব্রিটিশ আমল থেকেই এটা চলে আসছে। প্রাইভেট কম্পানিতে এরকম মরাল ক্যারেক্টার ঠিক রাখা তো আরও বেশি দরকার। এখানে সকলের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়ে যায়। ঝুড়িতে একটা পচা আম থাকলে অন্য ভালো আমও পচতে শুরু করে। একটা লোক নষ্ট চরিত্রের হলে সে অন্যদেরও দলে টানতে চায়। ওকে আগে দূর করে দেওয়া দরকার। ক্ষমা করে দিলে অন্য স্টাফরাও লাই পেয়ে যাবে, তারাও ওই পাড়ায় যাওয়া শুরু করবে?

সত্যেন বলল, কী যে বলেন স্যার। চন্দন একটা ভুল করে ফেলেছে, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ওসব পাড়ার ধারও মাড়ায় না। বাইরে থেকে যারা কলকাতায় ব্যবসা ট্যাবসা করতে আসে—

দীপক বলল, চন্দন ভুল করেছে মানে কী? কে কাকে ভুল বলে? ওইসব মেয়েরা অসহায় অবস্থার পাপে পড়ে, আর কোনো বাঁচার উপায় না পেয়ে, বাধ্য হয়ে এই পথে আসে। তাদের একজনকেও যদি কেউ নর্মাল জীবনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়, সেটাকে আমরা ভুল বলব? বরং এটা সমাজের ভুলের একটা প্রায়শ্চিত্ত।

পরমেশ বললেন, এসব বড় বড় কথা, বাজে কথা! ওই নোংরা মেয়েগুলো অনেকে ইচ্ছে করে...ওতেই বেশি মজা পায়। ওদের যদি রিহ্যাবিলেটেট করতেই হয়, তাহলে সেলাই ফোঁড়াই শেখানো, কিংবা ইয়ে, ধরো, মাদুরবোনা, কিংবা নার্স হবার ট্রেনিং দিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা বলে ওদের বিয়ে করে ফ্যামিলির মধ্যে ঢোকাতে হবে? সবাই জানবে, না, না। তাহলে পরিবারের মধ্যে পবিত্রতা বলে কিছু থাকবে না। আপনারা কি অন্ধ, এটা বুঝতে পারেন না?

দীপক বলল, আমি আপনার সঙ্গে এগ্রি করছি না!

পরমেশ বললেন, তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। আমি ওই ছোঁড়াকে তাড়াবো, তাড়াবো, তাড়াবো, এটাই আমার শেষ কথা! এবার আপনারা কী বলবেন, বলুন!

দীপক বলল, আমরা আমাদের কোনো সহকর্মীকে বিনা দোষে, শুধু আপনার খেয়ালেই স্যাক করা হবে, এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তাহলে আর আমাদের ওয়ার্কারদের মধ্যে ইউনিটি রইলো কী?

সত্যেন বলল, আমাদের ইউনিয়ানের একটা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে!

দীপক বলল, আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বলতে পারি, ইউনিয়ন যে-কোনো লোককেই ছাঁটাইয়ের বিরোধী!

চণ্ডীবাবু বললেন, তাহলে আর এখন... আমরা ইউনিয়ন মিটিং ডাকি, তিনদিনের নোটিস দিতে হবে, ...স্যার, অন্তত এক হপ্তা আপনি কোনো স্টেপ নেবেন না।

পরমেশ বলল, এক সপ্তাহ? ততদিন ওই ছেলেটা কী করবে?

দীপক বলল, চন্দন অফিসে আসবে। তাকে আজ অবশ্যই জয়েন করতে দিতে হবে।

পরমেশ বললেন, বলেছি না। ও ডিপার্টমেন্টে বসতেই পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশ ডেকে ওকে বার করে দেব।

দীপক বলল, তাহলে ডাকুন আপনি পুলিশ। আমরাও গেট আটকাবো। দেখি, কী করে পুলিশ ঢোকে। চলো, চলো, এখানে আর বসে থাকবার কোনো মানে হয় না!

পরমেশ বললেন, দাঁড়াও! আমার আর একটা প্রস্তাব আছে।

ড্রয়ার খুলে তিনি এক তাড়া কাগজ বার করলেন। দেখে মনে হয় কোর্ট পেপার।

সেই তাড়াটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী জানো?

ইউনিয়নের নেতারা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বুড়ো আবার কী নতুন চাল চালতে চাইছে?

পরমেশ বললেন, এটা একটা কো-অপারেটিভের ড্রাফ্‌ট। আমি এই কারখানার মালিকানা ছেড়ে দিচ্ছি। ছেড়ে, এটা তুলে দিচ্ছি একটা কো-অপারেটিভের হাতে। কো-অপারেটিভের সদস্যরা লাভ-লোকসান ভাগ করে নেবে। অবশ্য এ পর্যন্ত লোকসান কিছু হয়নি।

দীপক চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তাই নাকি? আমাদের কিছু জিজ্ঞেস না করে... সেই কো-অপারেটিভের মেম্বার হবে কারা?

পরমেশ বললেন, মেম্বার হবে তুমি! ও, ও, আমার এ কারখানার দারোয়ান, আর্দালি থেকে সমস্ত ওয়ার্কার। সব নাম টাইপ করা হয়ে গেছে। শুধু ওই চন্দন ছেলেটা বাদ। ওকে আমি কিছুতেই রাখব না!

প্রস্তাবটির আকস্মিকতায় এরা একটুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল।

পরমেশ আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বললেন, একটা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হবে, তারাই পলিসি ঠিক করবে, কত বোনাস দেওয়া হবে, বেশি লাভ হলে সে টাকাটা কী ভাবে ভাগ করা হবে। এসব দায়িত্ব সেই ট্রাস্টি বোর্ডের। অর্থাৎ ট্রাস্টি বোর্ডই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চালাবে কারখানা। ট্রাস্টি বোর্ডের সাতজন মেম্বার কারা হবে, তাও ঠিক করবে ইউনিয়ন। শোনো আমার যা বয়েস হয়েছে, কবে যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলব হঠাৎ, তার ঠিক নেই। এই কারখানাটা আমার সন্তানের মতন, অনেক রক্ত জল করা পরিশ্রমে এটা গড়ে তুলেছি। বেশি বাড়াইনি, কিন্তু ছোট কম্পানি হিসেবে এটা বেঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে সাকসেস ফুল। আমার নিজের ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি সব অপদার্থ, কেউ এটার ভার নিতে পারবে না। তাই আমার মৃত্যুর পরেও যাতে ব্যবসাটা না উঠে যায়, তাই তোমরা যারা এতদিন খেটেছো, তোমাদের হাতেই চালাবার ভার দিয়ে যেতে চাই। তারপর তোমরা এটা রাখবে না নষ্ট করবে, তা তোমাদের হাতযশ!

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমি আর যে-কটা দিন বাঁচব, তোমরা যদি চাও, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে থাকতে পারি। যদি সেটাও না চাও, তবে ভোট করে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারো। তাতেও আমার শেষের কটা দিন খাওয়া পরা জুটে যাবে।

চণ্ডীবাবু বললেন, না, না, স্যার, আপনি অবশ্যই থাকবেন। আপনি যা বললেন, কোনো মালিক সেরকম করে না। আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে কখনো চাপও দিইনি। আপনি নিজে থেকে

পরমেশ বললেন, এটা সিক ইন্ডাস্ট্রি না। প্রফিট মেকিং। কোথাও সে রকম লায়াবিলিটি নেই, বরং অনেক বিলের টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। এই ব্যবস্থায় তোমরা খুশি?

চণ্ডীবাবু বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই। এর চেয়ে আর বেশি কী চাইতে পারি।

দীপকের ভুরু সোজা হয়ে গেছে, রাগ-রাগ ভাব অন্তর্হিত। সে মোলায়েম গলায় বলল, স্যার, সত্যিই এটা, খুবই, মানে, আপনি তো আমাদের অভিভাবক হয়ে থাকবেনই, তবু একটা অনুরোধ আছে, কম্পানির সবাইকেই শেয়ার দিচ্ছেন, এর মধ্যে চন্দনের নামটা ঢুকিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়। ওকে ক্ষমা করে দিন!

স্বাস্থ্যের কথা ভুলে গিয়ে পরমেশ আবার বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, না! ও ছেলেটাকে, ও ছেলেটাকে আমি যা ভেবেছিলাম, না, না, এখন আর ওকে... কিছুতেই রাখা হবে না। এটা আমার জেদ বলো, অধিকার বলো...

সত্যেন বলল, স্যার, স্যার, আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। আমরা জোর করছি না, জাস্ট অনুরোধ—

পরমেশ দীপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি চাই, আমার কর্মীরা সৎ হবে, আদর্শবাদী হবে, তাদের কাজে নিষ্ঠা থাকবে। কোনো দুশ্চরিত্র, অ্যান্টি সোসাল এলিমেন্টের এখানে স্থান নেই। আমার জামাইকেও আমি এর মধ্যে রাখিনি, আমার মেয়েকে আমি অন্য প্রপার্টি দিয়ে যাব। আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি, তা যদি তোমরা ইন টো টো মানতে না চাও, তাহলে আমি এটা ছিঁড়ে ফেলে দেব। এক্ষুণি। তারপর তোমরা স্ট্রাইক করো, কম্পানি বন্ধ করো, আগুন জ্বালিয়ে দাও, যা খুশি করতে পারো, সব উচ্ছন্নে যাক।

সত্যেন বলল, না, না, স্যার, আমরা সবাই কম্পানিকে ভালবাসি। শুধু একজনের জন্য... কেউ দোষ করলে তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে।

দীপক বলল, আপনি আমাদের ওপর এতখানি দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন, তবু, এ কম্পানি আপনারই সৃষ্টি, আপনার নির্দেশ আমরা অবশ্যই মানব। আমিও মনে করি, কো-অপারেটিভের সব মেম্বারের একটা আদর্শ থাকা উচিত।

ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে পরমেশ বললেন, ইয়েস, হ্যাঁ, কথা বলছি, আচ্ছা ধরে আছি—

দীপকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাইটার্স থেকে, একজন মন্ত্রী কথা বলতে চান, আপনারা তাহলে এখন যান। এই ড্রাফ্‌টা নিয়ে যান, পড়ে দেখুন। বিকেলের দিকে আবার কথা হবে।

এরপর অফিসের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন শুরু হল। কাজকর্ম সব বন্ধ। এমনকি ছুটে এলো কারখানার কর্মীরাও।

শালকিয়ার আর একটা ওষুধের কম্পানি, এটার চেয়েও অনেক বড়, দেড় বছর আগে থেকেই রুগ্ন হয়ে পড়েছিল, তিন মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে, সেখানকার কর্মীরা কো-অপারেটিভ হিসেবে চালাবার দাবি নিয়ে অনেক আন্দোলন করেছে, মালিকপক্ষ কিছুতেই রাজি নয়, লেবার মিনিস্টারের ঘরে কয়েকবার মিটিংও ব্যর্থ হয়েছে, তিন মাস ধরে কেউ মাইনে পাচ্ছে না। আর এই কম্পানি কোনো রকম আন্দোলন ছাড়াই কো-অপারেটিভ হয়ে যাবে? লসে রান করছে না, মালিক ভেতরের কোনো অ্যাসেট সরাতে চাইছে না, সব দিয়ে দিচ্ছে কর্মচারিদের। এ যে অপ্রত্যাশিত দারুণ সৌভাগ্য।

দীপকরা তিন-চারজন ড্রাফ্‌টা খুঁটিয়ে দেখছে। তাদের ঘিরে গোল হয়ে আছে বাকি সব কর্মী। কেউ কেউ টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই নিজের চোখে দেখতে চায়, কো-অপারেটিভের মেম্বারদের তালিকায় তার নামও আছে কি না।

হ্যাঁ আছে, চণ্ডীবাবু পড়ে পড়ে শোনাচ্ছে, দারোয়ান, আর্দালি, কারুর নাম বাদ নেই, শুধু একটি নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

বারান্দায় উত্তেজিত আলোচনা শুরু হয়ে গেল ছোট ছোট গোষ্ঠীতে। মালিক এরকম একটা মহৎ কাণ্ড করেছেন, এরপর কোনো রকম আপত্তি তোলার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বুঝে শুনেই সব কিছু ভালোর জন্যই করেছেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে ইউনিয়নের নেতাদের, তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে চেয়ারম্যানকেও সরিয়ে দেবার। এর চেয়ে আর বেশি কী চাওয়া যেতে পারে?

চন্দন বসে আছে হলঘরের ঢোকার মুখে একটা চেয়ারে। তার হাতে কোনো বই বা কাগজপত্রও নেই। তবু, একেবারে চুপ করে ঘন্টার পর ঘন্টা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে তার কোনো অসুবিধে হয় না।

একটু দূরে যে আলোচনা চলছে, তাতে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তার নাম, কিন্তু কেউ তাকালো না তার দিকে, কেউ একবারও কাছে এসে কথা বলেনি তার সঙ্গে। একবার প্রীতম কোনো কারণে বাইরে যেতে গিয়ে, এদিকে অনেকটা এসেও থেমে গেল, তারপর ঘুরে গেল উল্টো দিকে। পেছনে, বাথরুমের দরজার দিক দিয়েও বাইরে যাওয়া যায়।

এক সময় দীপক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, আপনারা সবাই কাজে যান, প্লিজ, প্লিজ, যার যার সিটে বসে যান। মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে আমাদের আবার বিকেলে মিটিং হবে। তারপর ছুটির পর আমরা সবাই মিলে মিটিঙে বসবো। কেউ কাজ ফেলে রাখবেন না, প্লিজ, প্লিজ, সিটে গিয়ে বসুন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অফিস আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

পুরো কাজে মন না দিয়ে এখনো অনেকে কথা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে নিচু গলায়।

হঠাৎ সত্যেন মুখ তুলে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চন্দন। সত্যেন তার মুখের অস্বস্তির ছাপ লুকোতে পারলো না।

চন্দন মৃদু গলায় বলল, সত্যেনদা, আমাকে যে তিন মাসের মাইনে দেওয়া হবে, তা কতদিনের মধ্যে পাবো? আমি রেজিগনেশান লেটার পাঠিয়ে দেব কালই।

সত্যেন বলল, অ্যাঁ? তুই রেজিগনেশান দিবি কেন? চেপে বসে থাক। দ্যাখ না কী হয়।

চন্দন বলল, না, আমি আর এখানে কাজ করবো না।

সত্যেন বলল, এই বাজারে আর কোথায় কাজ পাবি? ইয়ে, এক কাজ করতে পারিস, কিছুদিন না হয় আসিস না, চুপচাপ থাক, তারপর কিছু একটা হবেই—

চন্দন আবার একই কথা বলল, না, আমি আর এখানে কাজ করবো না!

সত্যেন মুখ নিচু করে ফিসফিস করে বলল, বুড়ো এখন এমন টং হয়ে আছে, এখন আর কিছু করা যাবে না। পরে, মানে, কো-অপারেটিভের ব্যাপারটা একবার রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে, আমাদের হাতে ক্ষমতা আসবে, তোকে ঠিক ফিরিয়ে আনবো। আমি নিজে তোর জন্য ফাইট করবো।

এই কথার মধ্যে যে একটুও আন্তরিকতা নেই, কিছুমাত্র সত্যতা

ছোঁয়া নেই, তা একটি শিশুও বুঝতে পারবে।

চন্দন ফিরে যাচ্ছে, তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। যেন একজন চলেছে যূপকাষ্ঠের দিকে, তাকে গার্ড অফ অনার দিচ্ছে সহকর্মীরা।

বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এরকম একজন অধজনকে তো বলি দেওয়া যেতেই পারে।

শুধু দীপক, যাতে চন্দনের সঙ্গে তার চোখাচোখি না হয়, সেটা এড়াবার জন্য টেবিলের তলা থেকে একটা তুচ্ছ কাগজ তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার মাথা অনেকখানি নুয়ে গেছে।

ষোলো

এক সময় কলকাতায় পাঁউরুটির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হতো। মোটরগাড়ি কেনার জন্যও টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে হতো ছ'মাস, এক বছর। এখন সে অবস্থা বদলে গেছে, এখন পাঁউরুটি আর গাড়ি, রেশন-ছাড়া বাজারের চাল আর ফ্রিজ, টিভি ও টেলিফোন টাকা থাকলেই পাওয়া যায়। টাকাও আগের থেকে অনেক বেশিই পাওয়া যায়, যদিও সেই টাকায় তেমন মধুর শব্দ হয় না।

এমনকি বাড়ি-ভাড়াও সহজলভ্য। শুধু তা মধ্যবিত্তের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ কর্মচারি বা স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপকরা যা বেতন পান, তার থেকে মোটামুটি ভালো পাড়ায়, ভদ্রগোছের ফ্ল্যাট পাওয়া সম্ভব নয়। সরকারি আবাসন শস্তা হয়। কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। শুধু ভাগ্যবানদের সেরকম আশ্রয় জোটে। তাই এইসব মানুষ কলকাতা থেকে হটে যাচ্ছে মফস্বলের দিকে।

চন্দনও ভাগ্যবান। নিজের উদ্যোগে একটা পছন্দ মতন ফ্ল্যাট জোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারেও তাকে সাহায্য করে দুর্বার মহিলা সংগ্রাম কমিটির সদস্যারা।

রাধার সঙ্গে রেজিষ্ট্রি হবার পর সে তাকে নিয়ে উঠেছিল একটা গেস্ট হাউসে। সি আই টি রোডে। প্রতিদিনের চার্জ বারোশো টাকা। আজকাল এরকম অনেক গেস্ট হাউস গজিয়েছে, প্রায় হোটেলেরই মতন, সকালবেলা চা-জলখাবার দেয়, তার জন্য কিছু মূল্য লাগে, বাকি খাওয়া দাওয়া বাইরে। কোথাও কোথাও নিজস্ব রান্নার ব্যবস্থাও থাকে, সেখানে চার্জ আরও বেশি।

যারা সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, তারা দিনের পর দিন গেস্ট হাউসে থাকে না। সেটা সন্দেহজনক। গেস্ট হাউসে তো সংসার পাতা যায় না। তা ছাড়া চন্দনের যা উপার্জন, তাতে এত টাকা দিয়ে মাসের পর মাস থাকাও সম্ভব নয়।

সুমিতা আর দেবিকারও গেস্ট হাউসে আপত্তি ছিল প্রথম থেকে। তারপর গার্গী নামে আর একটি মেয়ে একটি সুখবর দিল।

তার পিসতুতো দাদা টালিগঞ্জের দিকে একটি সরকারি আবাসনে একটি ফ্ল্যাট পেয়েছে লটারিতে। কিন্তু সেটাতে তার একদিনও থাকা হয়নি। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, ফ্ল্যাটের যখন দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়েছিল, সেও তো পাঁচ-ছ বছর আগের কথা, তখন ওই পিসতুতো দাদা রজত সেনগুপ্ত ছিল এম আই জি অর্থাৎ মিডল ইনকাম গ্রুপে, এর মধ্যে তার অনেক পদোন্নতি হয়েছে, উপার্জন অনেক বেড়ে গেছে, এখন আর তার পক্ষে সাধারণ ফ্ল্যাটবাড়িতে গাঁচপেঁচি মানুষদের মধ্যে থাকাটা মানায় না, তার স্ত্রীও রাজি নয়।

এর মধ্যে আবার সে ট্রান্সফার হয়ে গেছে দিল্লিতে। ফ্ল্যাটটি খালিই পড়ে আছে। লটারিতে পাওয়া ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবারও কোনও মানে হয় না। সেটা নিয়ে কী করা হবে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। গার্গী চেষ্টা করলে অন্তত ছ'মাসের জন্য ফ্ল্যাটটা ব্যবহারের জন্য পাওয়া যেতে পারে।

রজত সেনগুপ্তের সঙ্গে, সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে ই-মেইলে চিঠি চালাচালি চলল কয়েকদিন। রজতের কোনও আপত্তি নেই। তার বোনের সংগঠনের কোনও কাজে সাহায্য করতে পারলে সে খুশিই হবে। অবশ্য হাজার দেড়েক টাকা ভাড়া আর মেনটেনান্স-এর খরচ দিতে হবে চন্দনকে, সেটা তার পক্ষে সম্মানজনকও বটে।

তিনতলার ফ্ল্যাটটি ভারি চমৎকার। ধপধপে সাদা দেওয়াল, খোলা মেলা, একদিকের একটা দেড় বিঘৎ বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যায় একটি খেলার মাঠ। ওদিকে কখনও বাড়ি উঠবে না।

দুর্বারের মহিলারা আর রাধার সহকর্মিনীরা এসে হৈ হৈ করে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়েছে। কেনা হয়েছে একটা নতুন খাট ও আলমারি, আরও দু'একটা টুকিটাকি আসবাব। রান্নাঘরের বাসনপত্র।

অকাতরে টাকা খরচ করেছে চন্দন। টাকার স্থিতিশীলতা সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। যে-যা বলছে, কিনে আনছে।

প্রথম চাকরি পাবার পর কয়েক মাস চন্দন তার মাইনের পুরো টাকাটাই তুলে দিত তার বাবার হাতে। রামমোহন তার থেকে পাঁচশো টাকা চন্দনকে ফিরিয়ে দিতেন তার হাত খরচের জন্য।

দিবাকরই প্রথম আপত্তি জানায়। সে সংসার খরচের জন্য অনেকটা টাকা দেয়, মুন্নিও দেয় মাসে দেড় হাজার, রামমোহনের পেনশনের টাকায় হাতই পড়ে না। চন্দন পুরো টাকা দেবে?

রামমোহন অবাক হয়ে বলেছিলেন, চন্দন আর টাকা দিয়ে কী করবে? ও কি কিছু বোঝে? ওর টাকা তো আমার কাছে জমা থাকছেই।

দিবাকর বলেছিল, বাবা, চন্দন আর ছেলেমানুষ নয়, বোকাও নয়। ওর নিজস্ব কিছু টাকা থাকবে না? যে-কোনও সেলফ রেসপেকটিং পার্সনেরই নিজস্ব কিছু টাকা থাকা দরকার।

মুন্নিরও সে রকম অভিমত।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, চন্দনের মাইনের অর্ধেক টাকা রামমোহন রাখবেন, বাকি অর্ধেক চন্দন পাবে। এসবই নির্ধারিত হয়েছিল চন্দনের অনুপস্থিতিতে।

পরের মাসে রামমোহন যখন অর্ধেক টাকা, দু'হাজার ছ'শো ঠেলে দিলেন চন্দনের দিকে, তখন সে বলেছিল, এ কী, এগুলো কী হবে?

রামমোহন ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, নে নে, রাখ। তোর দাদারা বলেছে, এতে তোর সেলফ রেসপেক্ট বাড়বে।

পাঁচশো টাকা পেয়ে যেমন হতো, দু'হাজার ছ'শো টাকা পেয়েও চন্দনের অন্য কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

এই কয়েক বছরে চন্দনের বেশ কিছু টাকা জমে গেছে। তার নিজস্ব খরচ যৎসামান্য, ক্যাসেট ও বই কেনা ছাড়া তার অন্য কোনও নেশা নেই, জামা-প্যান্টও পেঁজা পেঁজা না হলে বদলায় না। শিয়ালদার কাছে একটা ব্যাঙ্কে তার নামে আছে প্রায় সত্তর হাজার টাকা।

এর মধ্যে চন্দনের মাইনেও বেড়েছে, এই জানুয়ারি থেকে সাত হাজার আটশো।

আজকাল ট্রান্সপারেন্সি বলে একটা শব্দ খুব চালু হয়েছে। চন্দনের সব কিছুই স্বচ্ছ। সে কত উপার্জন করে, কত টাকা জমা আছে, তা কারুরই জানতে বাকি নেই। তার নবলব্ধ শুভার্থীদের ধারণা, সঞ্চিত অর্থ সংসার পাততে গিয়ে অনেকটা খরচ হয়ে গেলেও মাসিক সাত হাজার আটশো টাকায় সাদামাটাভাবে এই ছোট্ট ফ্যামিলির দিব্যি চলে যেতে পারে। দেশের কত শতাংশ মানুষ এই টাকা রোজগার করে?

রাধাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। সে শাড়ির ওপর কাঁথার কাজ করতে শিখেছে। সূচিশিল্পে তার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তার জন্য অর্ডার এনে দেওয়া হবে, দুপুরগুলো তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

প্রথম কয়েকটা দিন কেটে গেল ঘোরের মধ্যে। সর্বক্ষণ বাড়ি ভর্তি। রাধার এই অবস্থানান্তরে কিংবা সৌভাগ্যে তার সোনাগাছির বাড়ির অন্য মেয়েদের কারুর কারুর হয়তো হিংসে হতে পারে। কিন্তু তা তারা বুঝতে দেয় না। সারাদিন এসে সবাই হাস্য পরিহাসে মেতে থাকে, মিলেমিশে রান্না করে। খবরের কাগজ পেতে বসে কাগজের প্লেটে খাওয়া হয়। হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে মুসাফির। তার বগলে থাকে ঠোঙায় মোড়া একটা মদের বোতল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কী গো, আজ কী রান্না হলো? কী মাছ? পয়সা দাও না, খানিকটা খাসির মাংস কিনে আনি।

দুর্বারের মহিলারাও আসে নানা রকম পরামর্শ দিতে। রাধা কিছুদিন ওদের সমিতির হয়ে এইচ আই ভি/ এইডস নিরোধের প্রচারে কাজ করেছে। সে কাজ তাকে পরেও করতে হবে। এখন কিছুদিন ছুটি দেওয়া হয়েছে। তারাও অন্যদের সঙ্গে একসারিতে বসে খায়।

একটা ব্যাপারে তারা কঠোর। সোনাগাছির মেয়েরা যে এখানে দুপুরে মদের আসর বসাবে, তা চলবে না। হৈ-হল্লা করলে এই আবাসনের অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বিরক্ত হবে, তারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে এখানে টেঁকা যাবে না। সামাজিক জীবনযাপন করতে গেলে কতগুলো নিয়ম কানুন মানতেই হয়।

মুসাফিরকে তারা বলে, আপনাকে তো বারণ করে লাভ নেই, আপনি শুনবেন না। তবে, অন্যদের খাওয়াবেন না। আর আপনি যখন এখান থেকে বেরুবেন, তখন দেখবেন যেন পা না টলে।

মুসাফির হেসে বলে, ওগো দিদিমণি, আমার পা টলাতে গেলে যতখানি মাল টানা দরকার, ততটা আর কে দিচ্ছে? এ তো ভিক্ষের খুদ কুঁড়ো।

সন্ধের পর আর কেউ থাকে না।

রাধা এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। ইনফেকশনের জন্য চোখের ফোলাটা অনেকটাই কমেনি। আধখানা চোখ ঢাকা। ভাঙা দাঁতগুলোর জায়গায় নতুন দাঁত এখনও বসানো হয়নি, জায়গাটা শুকোবার জন্য সময় দেওয়া দরকার। দুটো নড়বড়ে দাঁত তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

রাধা তার দেড়খানা চোখ দিয়ে মাঝে মাঝেই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকে চন্দনের দিকে। এই লোকটা এত ঝুলোঝুলি করে কেন তাকে বিয়ে করে ঘরের বউ বানাতে চাইল, তা সে এখনও বুঝতে পারছে না। এ লোকটা বদমাস না হতে পারে। কিন্তু ভোগীও তো নয়।

এ পর্যন্ত চন্দন তাকে একবারও আলিঙ্গন পর্যন্ত করেনি।

রাধার স্বভাবে একটু আপাত রুক্ষতা আছে। যে-সব মেয়েরা একেবারে পরিবার বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, শুধু জীবিকা নয় সব ব্যাপারেই বাধ্যতামূলক ভাবে স্বাধীন, তারা কোমলতা, নমনীয়তা বিসর্জন দিতেও বাধ্য হয়। যেন আত্মরক্ষার জন্যই তাদের সারা গায়ে সজারুর কাঁটা ফুলিয়ে রাখা দরকার। বিশেষ করে রাধার মতন যাদের পেশা তাদের তো অন্য উপায়ই নেই। পুরনো বাংলায় একটা কথা আছে। মুখচোরা বেশ্যা আর কেশো রুগী চোরদের ব্যর্থতাই নিয়তি। তাই সব বেশ্যাদেরই খরখরে চোপা আয়ত্ত করে নিতে হয়।

রাধা যখন তখন চন্দনকে পরীক্ষা করতে চায়। চন্দন তাকে সোনাগাছির বাড়ি থেকে বার করে এনেছে, এটাকে সে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বারবার বোঝাতে চায় যে, রাজি হয়ে সে চন্দনকেই ধন্য করেছে।

সে জন্যই সে চন্দনকে প্রথম দিন থেকেই হুকুম করতে শুরু করেছে, কী ধরনের পর্দা আনা হবে জানলার জন্য। রাত্তিরের রান্নার জন্য প্রেশার কুকার চাই। তার চন্দন সাবান মাখা অভ্যেস। ভেটল লাগবে। ঝাল আচার লাগবে। পাপোস কেনা হয়নি কেন?

দু'তিনদিন বাদেই সন্ধেবেলা রাধা বলেছিল, দেখো বাবু, তুমি না হয় মাল খাও না, খাও না। কিন্তু আমার যে মাল খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। সিগারেট খাইনি ক'দিন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে এসব ছাড়তে হবে?

চন্দন বলেছিল, না। তোমার ইচ্ছে হলে খাবে।

কে ওসব এনে দেবে? আমি রাস্তায় বেরুবো?

আমি এনে দিতে পারি। মাল মানে তো মদ। দোকানে গিয়ে কী বলতে হবে?

বলবে, রাম।

রাম? শুধু রাম বললেই হবে?

তুমি কি কিছুই জানো না? একটা বয়েস হল, ও পাড়ায় যেতে শিকোচো, কোনওদিন মাল খেয়ে দেখনি? আমি এমন কোনও বাবু দেখিনি, যারা ও পাড়ায় আসে কিন্তুক মাল টানে না!

আমি খেয়ে দেখেছি দু'একবার। ভালো লাগেনি। তুমি খাও, আমি এনে দিচ্ছি। কী সিগারেট?

চন্দন বেরিয়ে গিয়ে দোকান খুঁজে মদের বোতল কেনে, সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে ফিরে আসে।

রাধা গেলাসে ঢেলে একা একা মদ্য পান করে, চন্দন গান শোনে। একটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার আর কিছু ক্যাসেটও কেনা হয়েছে। রাত্তিরের দিকে কিছু না কিছু গান বাজনা না শুনলে চন্দনের শারীরিক অস্বস্তি হয়।

একটু নেশা হলে রাধা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তুমি কী সব প্যানপ্যানানি গান শোনো? আমার গা জ্বলে যায়। তুমি 'দিল এক মঞ্জিল' সিনেমাটার গান শোনোনি? শ্রীদেবী গেয়েছে। কেনার খানের সুর, আর, সে গান শুনলেই নাচতে ইচ্ছে করে।

চন্দন তখনই বেরিয়ে গিয়ে গোটা কতক হিন্দি ফিলমের ক্যাসেট কিনে আনে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে রাধার পছন্দ মতন গান চালিয়ে দেয়।

ততক্ষণে রাধার আরও একটু নেশা হয়েছে। রাধা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, তুমি কী গো? তুমি কি বাটাছেলে?

চন্দন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাধা আবার বলে, তোমার যদি কোনো ভদ্দরলোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে-শাদী হতো, তা হলে তোমাকে বলতো ম্যাদা ভেড়ুয়া। তুমি বউয়ের সব কথা শুনে চলো কেন?

চন্দন উত্তর দেয়, মানুষ মানুষের কথা শুনবে না?

রাধা ধমক দিয়ে বলে, না! বাটাছেলে সব সময় ওপরে থাকে, মেয়েমানুষ নীচে। বাটাছেলে মাঝে মাঝে মেয়েমানুষদের দাবড়ে রাখবে, তবে তো তোমায় মানবে! মেয়েমানুষ বেশি জেদিপনা করলে দু'এক ঘা চড় চাপড় দেবে।

তা শুনে চন্দন হাসে। জীবনে সে কারুর গায়ে হাত তোলেনি, দাবড়াতেও শেখেনি।

দিন দশেক পরে চন্দন সন্ধেবেলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, রাধা একটা মদের খালি বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে। বোতলটা দেখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

চন্দন ব্যস্ত হয়ে বলল, ফুরিয়ে গেছে? দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

রাধা বলল, থাক, আজ আর আনতে হবে না।

চন্দন বলল, কেন? আমি জামাটা পরে নিয়েই

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টিতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। দোকান তো কাছেই।

বলছি তো আজ থাক। একদিন না খেয়েই দেখি না। আগে কি আমি খেতুম? লাইনে কাজ শুরু করার পর বাবুরা আসত, তাদের প্রত্যেকের মুখে মালের গন্ধ। কিস্ করতে এলে আমার গা গুলিয়ে উঠত। একদিন একজন বলল, তুই নিজে একটু খেয়ে দ্যাখ, তারপর আর গন্ধ পাবি না। একটু টেস্ করে দেখি, সত্যিই তাই। বাবুদের সঙ্গে খেতেখেতেই তো নেশা ধরে গেল। কখনও তো একলা খাইনি। এই ক'দিন একলা একলা খেয়ে দেখছি, কেমন যেন জমে না।

তুমি একলা খেলেও আমার দেখতে ভালো লাগে। হঠাৎ ছেড়ে দিলে যদি তোমার অসুবিধে হয়। আমি বোতল এনে দিচ্ছি।

দেখো বাবু, আমি খেতে না চাইলেও তুমি আমাকে জোর করে খাওয়াবে? এ তো আচ্ছা মুশকিল।

তুমি আমাকে দেখো বাবু, দেখো বাবু বলো কেন? শুনতে ভালো লাগে না।

তবে কী বলব?

চন্দন, আমার নাম। তোমার নাম যেমন রাধা। আমি তো তোমার বাবু নই।

আমার আর একটা নাম হাসু।

আমারও একটা ডাকনাম আছে, খোকন। মা ওই নামে ডাকত।

খোকন মোছলমানদেরও ডাকনাম হয়। আমাদের দেশেই একটা ছেলে ছিল, তার নাম মিজানুর রহমান। ডাকনাম খোকন। তুমি কি মোছলমান?

না, তা নয়। আমার বাবা হিন্দু। তবে বাড়িতে পুজোআচ্চা কখনও দেখিনি। শুধু আমার মা রামকৃষ্ণের ছবির সামনে বসে থাকতেন। রামকৃষ্ণ কে তুমি জানো?

নামটা শোনা শোনা। সিনেমায় দেখিছি বোধহয়। আমরা কিন্তু মোছলমান। আমার বাবা নামাজ পড়ত না। সেই জন্য অত রাগী। তোমায় প্রথম দিনকে যে গল্পটা বলেছিলুম, তুমি বিশ্বাস করেছিলে?

না, সবটা বিশ্বাস করিনি।

কেন বিশ্বাস করোনি গো?

কেমন যেন গল্প গল্প মনে হয়েছিল।

গল্পই তো। কিন্তু তুমি কী করে বুঝলে? ঠিক করে বলতে পারিনি।

তা নয়। আমি গল্পের বই পড়ি তো, কেমন যেন মিলে যাচ্ছিল।

ঠিক বলেছ। একখানা ছবিওয়ালা বইয়ের গল্পটা ছিল, আইবুড়ো আমাদের এক দুপুরবেলা পড়ে শুনিয়েছে। তারপর বলেছিল, তোমাদের কোনও বাবু এসে লায়েক এস্টোরি জানতে চাইলে এইটে শুনিয়ে দিবি। তবে, গল্পে ছিলো মেয়েটা তাঁতির বাড়ির, আমাকে বলল, এটা ...

তুই বামুনের মেয়ে করে দিবি। যে-সব ছোট জাতের মক্কেলরা আসে, তারা বামুন জানলে খুশি হবে। বামুনের মেয়েকে ঝাড়ছে ভেবে আনন্দ বেশি পাবে, এতকাল ধরে বামুনরা তাদের ওপর যা-যা করেছে, যেন তার শোধ তুলছে!

তোমাদের এই ভাইদাদা, মানে মুসাফির মানুষটা কে?

তা জানি না। কোথা থেকে যেন এসে ও-বাড়িতেই থেকে গেছে। পালা করে এক একজনের ঘরে যায়। বিপদে-আপদে বুদ্ধি দেয়। মানুষটার নিজের কিছু দুঃখু আছে, কিন্তু তা বলে না কক্ষনও।

চন্দন বসেছে জানলার কাছে, বৃষ্টির ছাট লাগছে তার গায়ে। রাধা আগের অভ্যেস মতন, অন্য কেউ না থাকলে শাড়ি খুলে রাখে, শুধু পেটিকোট আর ব্রা। পাখা ঘুরলেও তার গরম লাগে।

মদ্যপান করছে না বটে, সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। একবার কপালের দাগটায় হাত বুললো। এক একদিন দাগটা যেন বেশি জ্বলজ্বল করে, এক একদিন চাপা পড়ে যায়।

চন্দন বলল, তোমার কপালের কাটা দাগটা সম্পর্কে যা বলেছিলে সেটা বানানো নয়, শুনেই বুঝেছি!

রাধা একটু অন্যমনস্ক হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, বানানো নয়। ও কথাটা আমি অন্যদের বলি না। শুধু তোমায় যে কেন বললুম, তুমি বারবার জানতে চাইছিলে—

উঠে গিয়ে সে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

চন্দন বৃষ্টির ছাট উপভোগ করে, কিন্তু আপত্তি জানালো না।

রাধা চন্দনের চেয়ারের একেবারে সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে বলল, একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি আমায় বিয়ে করলে কেন?

চন্দন সরলভাবে বলল, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, সেই জন্য।

রাধা কড়া গলায় বলল, বাজে কথা! তুমি আসলে আমাদের মতন মেয়েদের ঘেন্না করো! তাই না?

না, না, এ কী বলছ, ঘেন্না করব, না, না, না।

তা হলে তুমি আমার সঙ্গে বসতে চাও না কেন?

বসতে চাই না? তার মানে? রোজ সন্ধেবেলাতেই তো তোমার সঙ্গে—

ধ্যাত তেরি! তুমি কি তা? বোঝো না। তুমি কি দুধের বাচ্চাটি! মানুষ বিয়ে করে কেন? পুরুষ মানুষরা যে জন্য বিয়ে করে, মেয়েমানুষের কাছে যা চায়, ওই ইয়ে, তা তো তুমি আমার কাছে কখনও চাওনি। আমার এই গতরটা তোমার পছন্দ হয় না!

না, না, না, আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাইনি।

তবে তুমি একদিনও আমাকে ছুঁয়েও দেখনি কেন? তোমার বুঝি ওসব ইচ্ছে করে না?

হ্যাঁ, ইচ্ছে করে। তুমি তো এখনও অসুস্থ। আগে ভালো হয়ে ওঠো—

ছাই অসুস্থ! চোখের ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। ওতে কোনও অসুবিধে হয় নাকি? আর সব কাজকম্ম করতে পারছি, শুধু ওটা—

তুমি একেবারে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে, হাসবে, তখন আমি তোমাকে, না আমরা দু'জনে দু'জনকে আদর করব।

এখন বুঝি হাসতে পারি না? এই দ্যাখো না, হি-হি-হি-হি। ফোকলা দাঁতেও হাসা যায়।

ওটা তো হাসি নয়, হাসির ভেংচি। যখন তুমি মনের আনন্দে হাসবে, কথা বলতে বলতে হেসে উঠবে, আমি সেই হাসিটা দেখতে চাই। রাধা, আমি তোমাকে কোনওদিন চড় মারব না, তোমার সব কথা শুনব, তোমার হাসি মুখটা ফিরিয়ে আনার জন্য যা করতে হয় সব করব। তখন আমাদের ভালোবাসা হবে।

কী জানি, বুঝি না বাপু। আমার সব সময় মনে হয়, আমি শুধু তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি, কিছু দিচ্ছি না, মেয়েমানুষ যা দিতে পারে—

মেয়েরা ভালোবাসা দিতে পারে।

চন্দন উঠে দাঁড়িয়ে, রাধার শরীর যে সে অপছন্দ করে না যেন তার প্রমাণ দেবার জন্যই সে এই প্রথম সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

তারপর রাধার আহত চোখটিতে সে একবার আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো শুধু।

সতেরো

এর মধ্যে চন্দনের চাকরি চলে গেছে। সে কথা সে রাধাকে জানায়নি, দুর্বারের মহিলাদেরও কিছু বলেনি।

তার জমা টাকা সব শেষ হয়নি এখনও। তা ছাড়া সে তিন মাসের মাইনে পাবে। অর্থাৎ এক্ষুনি তাকে অভাবের মধ্যে পড়তে হবে না। কিন্তু চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের কথা। এইটুকু অন্তত সংসারজ্ঞান তার হয়েছে যে, টাকা না থাকলে মানুষের মুখের হাসি শুকিয়ে যায়। বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা স্ত্রী-পুত্রের অনাহার সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে। বেকার দিনমজুর ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ের কান্না শুনে তাদের আছড়ে মেরে ফেলে, তারপর নিজেও আত্মহত্যা করে।

টাকা দিয়ে মুখের হাসি কেনা যায় না। কিন্তু টাকা না থাকলে মুখে হাসি ফোটাবার কোনও উপায় নেই।

চাকরির বাজার সত্যিই টাইট, সমস্ত সরকারি অফিসে নতুন নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ। বহু কল-কারখানার দরজায় তালা কিংবা রুগ্ণতায় ভুগছে। চন্দনের বিশেষ কোনও যোগ্যতাও নেই।

চন্দন যথারীতি অফিসের সময় বেরিয়ে যায় প্রত্যেকদিন। কোনও পার্কে গিয়ে বসে থাকে। কিংবা শুয়ে পড়ে ঘাসের ওপর।

একদিন চন্দন স্নানখাওয়া সেরে বেরুচ্ছে, একতলার সিঁড়ির কাছে এক ব্যক্তি তাকে দেখে বলল, চন্দন না? তুমি এখানে থাকো নাকি?

লোকটি সোদপুরে তাদের পাড়ার কাছেই একটা চায়ের দোকানের মালিক। চন্দন সে দোকানে চা খেতে যায়নি কখনও, কিন্তু মুখ চেনা। সন্তোষবাবু।

সন্তোষ বলল, আমার মেয়েজামাই থাকে এখানে। ওই যে একতলার ফ্ল্যাট, আমার জামাইয়ের নাম রণবীর সামন্ত, আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে?

চন্দন বলল, না।

সন্তোষ বলল, আলাপ কোরো, ভালো লাগবে। আমার জামাই দিশি বিস্কুটের ব্যবসা করে, এর মধ্যে একটা ছোটখাটো কারখানাও খুলে ফেলেছে। আজ অদ্দূর থেকে ঠেঙিয়ে এসেছি, নাতির মুখেভাত। আগে একটা মেয়ে হয়েছিল, এবারে ছেলে, ভারি ফুটফুটে দেখতে হয়েছে—

বাইরে বেরিয়ে চন্দনের মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল। এই লোকটির সঙ্গে দেখা হওয়াটা তার পছন্দ হয়নি।

এর মধ্যে সোদপুরের বাড়ির কথা চন্দনের দু' একবার মনে পড়েছে মাত্র। তাতে কোনও বিষাদ নেই। স্মৃতিকাতরতা নেই। শুধু নিজের জমানো ক্যাসেটগুলোর জন্য সামান্য আফসোস। ও-বাড়িতে আর কোনওদিন যাওয়া হবে না, চন্দন জানে।

পরিবারের মধ্যে একমাত্র বড় দাদাই তার প্রতি স্নেহশীল ছিল। সেই জন্য চন্দন তার জীবন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত সেই দাদাকেই শুধু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু দিবাকর আগে কখনও চন্দনের গায়ে হাত তোলেনি, গাড়িতে বসে যখন চড়টা মারলো, তখনই চন্দন বুঝে গিয়েছিল, বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ।

মা বেঁচে থাকলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হত না।

মানুষ তো নিজের ইচ্ছেমতনই বাঁচবে। অন্য লোকের তাতে ক্ষতি না হলেও তাতে বাধা দিতে আসে কেন?

শিয়ালদার কাছে কোর্টের সামনে অনেক টাইপিস্ট বসে। সেখানে গিয়ে চন্দন চাকরির দরখাস্ত টাইপ করায়, আজ থেকে সে জায়গাটা বদলে ফেললো, ধর্মতলা পোস্ট অফিসের সামনেও টাইপিস্ট পাওয়া যায়। শিয়ালদার কাছে তার বেশি ঘোরাফেরা ঠিক নয়, সব সময় ট্রেনে করে সোদপুর থেকে গাদা গাদা লোক আসছে, তাদের কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। সে ওখানকার কারুর সঙ্গেই কথা বলতে চায় না।

রাধার একটা রেফ্রিজারেটার কেনার সাধ হয়েছে। নতুন না হোক, সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও চলবে। বাড়িতে একটা ফ্রিজ থাকলে রান্না খাবার খানিকটা বেঁচে গেলেও নষ্ট হয় না। ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ খেতে কী ভালো লাগে। মাগনা বরফ পাওয়া যায় যখন-তখন।

সেকেন্ড হ্যান্ড আর কোথায় খুঁজবে, চন্দন একটা নতুন ফ্রিজই কিনে ফেলেছে। যদিও এই প্রথম তার একটু দ্বিধা হয়েছিল। অনেকগুলো টাকা। ভবিষ্যতে উপার্জনের একটা কিছু শুরু করতে না পারলে অভাবের দিন শুরু হয়ে যাবে। রাধা যদি আরও কিছু চায়? চন্দন তাকে না বলবে কী করে?

রাধার মদের খরচ অবশ্য কমে গেছে। সে আর পান করছে না। শুধু একদিন মুসাফির এসে চন্দনকে বলেছিল, আজ আর সঙ্গে করে আনতে পারিনি ব্রাদার, এক বোতল মদের দাম দাও। তোমাদের বিয়েতে আমিও তো কিছুটা ঘটকালি করেছি, তার জন্য কিছু দস্তুরি তো দাওনি।

বোতল কিনে এনে দুটি গেলাসে ঢেলে একটি রাধার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে, চিয়ার্স কর।

রাধা বলল, আমি খাব না।

বিস্ময়ে ভুরু তুলে মুসাফির বলল, অ্যাঁ? খাবি না কী রে বেটি! ব্রত-টুত করেছিস নাকি?

রাধা বলল, আমি আর খাচ্ছিই না।

আরও ভুরু উঁচিয়ে মুসাফির বলল, কী তাজ্জব কথা শুনছি। এত দিনের নেশা, ছেড়ে দিতে পারলি? চন্দন ব্রাদার, তুমি যে কামাল করে দিলে, ওকে রিফর্ম করতে উঠেপড়ে লেগেছ বুঝি?

চন্দন বলল, আমি একবারের জন্যও বারণ করিনি। ওকে জিজ্ঞেস করুন!

মুসাফির বলল, তবে কি পতিব্রতা? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। স্বামী মদ ছোঁয় না বলে তুইও ছুঁবি না? নে নে, আর ভড়ং করিসনি। আমার সঙ্গে একবার গেলাসে চুমুক দে।

চন্দন বলল, হ্যাঁ, খাও না।

এ কথায় রাধা কেন রেগে উঠল কে জানে। সে তীব্র গলায় বলল, খবরদার, তুমি কোনওদিন আমায় এসব খেতে বলবে না!

মুসাফির হো-হো করে হেসে উঠে বলল, শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে! তা তো হবেই। বিয়ে করবে, আর বউয়ের ঝিড়-ঝামটি খাবে না, তা কখনও হয়। ইট কামস ফ্রি উইথ দা প্লেজার অফ ফ্লেশ। যদি কখনও সিরিয়াস ঝগড়াঝাঁটি হয়, আমাকে ডেকো। আমি মধ্যস্থতা করার মাস্টার। এমন কাণ্ড করব, যাতে আমার ওপর রেগে যাবে। কিন্তু দু'জনের ভাব হয়ে যাবে।

মুসাফির এলে চন্দনের ভালো লাগে। লোকটির প্রত্যেক কথার মধ্যেই রস আছে।

এখন আর প্রত্যেক দুপুরে কেউ আসে না। চন্দন বেরিয়ে গেলে রাধা দরজা বন্ধ করে রাখে। আজকাল ফ্ল্যাটবাড়িতেও কত রকম কাণ্ড ঘটে, সাবধানে থাকতে হয়। আগেকার জীবনে রাধা জানলাও সব বন্ধ করে রাখত, এখনও সে জানলা খুলতে ভুলে যায়।

তার সুবিধে এই, স্নান করার পর সে শাড়ি তো পরেই না, ব্রা-ব্লাউজও অপ্রয়োজনীয়, সে শায়াটাকেই টেনে বুকের ওপর পর্যন্ত তুলে বেঁধে রাখে। কেউ তো দেখবার নেই, বাইরে থেকেও কেউ দেখতে পাবে না। দুপুরটা কাটে এইভাবে।

আজ অবশ্য বিকেলের আগেই শাড়ি পরতে হয়েছে।

একটা ইলেকট্রিক টোস্টার কেনা হয়েছে, পাঁউরুটির স্লাইসগুলো তার মধ্যে দিলে যেই টোস্ট হয়ে যায়, অমনি আপনি আপনি লাফিয়ে ওঠে। সেটা দিন তিনেক বেশ চলছিল, আজ সকালে প্লাগটা ঢোকাতেই কারেন্ট চলে গেল। ফিউজ পুড়ে গেছে।

আবাসনের একটা নিজস্ব অফিস আছে, সেখানে খবর দিলে মিস্তিরি পাঠায়। চন্দন সব ব্যবস্থা করে অফিসের সময়ে বেরিয়ে গেছে। মিস্তিরি এসেছে এগারোটায়। সে কাজ করল অনেকক্ষণ। আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, আলো জ্বললো। চালু হল ফ্রিজ, টোস্টারে লাফিয়ে উঠল দু' স্লাইস পাঁউরুটি।

সেই রুটি দুটো জ্যাম মাখিয়ে মিস্তিরিকেই খেতে দিল রাধা। তাকে দিতে হবে আটান্ন টাকা। শয়নকক্ষের ড্রয়ারে চন্দনের টাকাপয়সা থাকে, কিছু বখশিসও দেওয়া উচিত, রাধা আশি টাকা এনে দিল।

মিস্তিরি চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করতে যাবে, রাধা দেখল একজন বৃদ্ধ লোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে, রাধার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, চন্দন দে সরকারের কোন্ ফ্ল্যাট?

রাধা বলল, এইটে।

বৃদ্ধ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগলেন, উফ উফ, তিন তলা। আজকাল আর পারি না, উফ, বড্ড কষ্ট হয়, হাঁটুতে ব্যথা। চন্দন আছে বাড়িতে?

রাধা বলল, না, আপিসে গেছে।

বৃদ্ধ বললেন, একটু বসব। দাঁড়াতে পারছি না। বাইরে বড্ড রোদ।

রাধা বলল, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

সে পাখা চালিয়ে দিল।

বৃদ্ধ চটিজুতো খুলে বেতের চেয়ারটিতে বসলেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, যদিও শীত পড়েনি, তবু পাঞ্জাবির ওপরে একটা জহর কোট। গালে তিন-চার দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার পাতলা চুল সব সাদা। এই বয়েসের লোকদের সাধারণত চোখে চশমা থাকে, এঁর নেই। দু' চোখের নীচে কালো দাগ।

পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি মুখ মুছে একটু শান্ত হলেন। তারপর রাধার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি চন্দনের বাবা।

রাধার বুকটা ধক করে উঠল। চন্দনের বাবা? সে কি জানে না যে তাকে বিয়ে করার জন্য চন্দন তার নিজের বাড়িঘর, সংসার, মা-বাবা, ভাইবোন, সবাইকে ছেড়ে এসেছে? সুমিত্রাদিরাও জানে। চন্দন কিছুতেই তার বাড়ির মানুষদের কথা বলতে চায় না।

সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে রামমোহনের দুই নগ্ন পায়ে হাত রাখল।

সে অল্প বয়েস থেকেই কদমবুসি করা শিখে নিয়েছে, হিন্দুদের মতন পায়ের ধুলো নিতেও জানে। কত সিনেমায় দেখেছে।

রামমোহন তার মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে হাত রেখে বললেন, বেঁচে থাকো মা। আমায় এক গেলাস জল খাওয়াবে? গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

রাধা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে গেলাসে ঢালতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি কি আমার হাতের জল খাবেন?

রামমোহন বললেন, ওমা, কেন খাব না? সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। মানুষের মধ্যে যারা জাত-বেজাতের ভেদ করে, তারা পাপী। আমরা হোটেলে গিয়ে জল চেয়ে খাই না? কে জানছে, বেয়ারাগুলো কে কোন্ জাতের?

রাধা বলল, আপনারা ব্রাহ্মণ তো!

রামমোহন বললেন, না, না, কে বললে আমরা বামুন? আমরা পশ্চিমবাংলার বনেদি কায়েত।

ঢক ঢক করে জলটা শেষ করে রামমোহন বললেন, আঃ! প্রাণটা জুড়লো! ফ্রিজটা ভারি সুন্দর তো? নতুন বুঝি?

উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে খেলার মাঠটা দেখতে দেখতে তিনি বললেন, এ ফ্ল্যাটটাও তো বেশ ভাল। তিনতলা, এই যা। এর কত ভাড়া দাও?

রাধা বলল, আমি ঠিক জানি না।

নারীদের মতন কৌতূহলে রামমোহন ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখতে লাগলেন। এইটা বেডরুম? বাঃ, দক্ষিণ খোলা, আর একটা ছোট ঘরও আছে। রান্নাঘরটা বেশ বড়, এখনও গ্যাস আনোনি? আর বাথরুম কোথায়?

বাথরুম দেখতে ভেতরে ঢুকে গিয়ে রামমোহন দরজা বন্ধ করে দিলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, সব বেশ পরিষ্কার। আমার ছেলে, চন্দন আমার ছোট ছেলে, তার কি আক্কেল দেখো। একবার আমাকে বউ দেখাতে গেল না? হ্যাঁ, বাপ-মাকে কিছু না জানিয়ে ছেলে হঠাৎ নিজে নিজে বিয়ে করলে তো রাগ হতেই পারে। কিন্তু সেই রাগ কি বেশি দিন থাকে? চন্দন যদি তোমাকে নিয়ে একবার সোদপুর যেত, আমি কি মারতুম না ধরেবেঁধে রাখতুম?

চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, আর এক গেলাস জল দাও, খুব ঘন ঘন তেষ্টা পায়। ব্লাড সুগার বোধহয় বেড়েছে।

আবার জল শেষ করে তিনি বললেন, ওর মা বেঁচে থাকলে কি চন্দন একবারও বাড়িতে না গিয়ে পারত? চন্দন যখন এইটুকুখানি, এই ধরো তিন-চার বছর বয়েস, আমাদের ওই দিককার গাজনের মেলায় নিয়ে গেছি, সে বিরাট মেলা, অজস্র ভিড় ছিল, এখন আর তেমন জাঁকজমক নেই শুনিছি, আমরাও যাই না। সেই মেলাতে ছোট ছেলেকে নিয়ে ঘুরছি, পই পই করে বলিছি, খবরদার, আমার হাত ছাড়বিনি, ওমা, তবু কী করে

This Book Downloaded From http://doridro.com

ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দেখি যে চন্দন নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই, সারা মেলা দৌড়দৌড়ি করে, তখন আমার গায়েও খুব শক্তি ছিল, কোনও জায়গায় পাই না। আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল, খালি মনে হতে লাগল, ওকে যদি কোনও ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমি ফিরে গিয়ে ওর মাকে কী কৈফিয়ত দেব? তার চেয়ে বরং... তোমায় সত্যি বলছি, মা মনসার বিব্যি, আমি ঠিক করেছিলুম, ছেলেকে না পেলে আমি বাড়ি যাব না। ওখানেই রেললাইনে গলা দেব!

রাধার মনের কোনও এক তন্ত্রীতে দারুণ ঘা লাগল।

তারও মনে পড়ে গেল একটা মেলার কথা। কী মেলা যেন, ও হ্যাঁ, চুন্নু সাঁইয়ের মেলা। মুর্শিদাবাদ জেলায় চুন্নু সাঁইয়ের মেলার খুব নামডাক। অনেক গরু-ছাগল-মোষ, এমন কি কোরবানির জন্য উটও বিক্রি হয়। ঘোড়া থাকে। আর পাঁপড়ভাজা, জিলিপি-গজার দোকান, তখন রাধার নাম রাধা নয়, হাসু। তার সব মনে আছে। এগারো বছর বয়েস, মনে থাকবে না? তার আব্বাজান নিয়ে গিয়েছিল, আব্বাজান কোনওদিন তাকে একটাও মিঠে কথা বলেনি, অতগুলো মেয়ের বাপ বলে সবসময় তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকত, আর তাড়ি খেয়ে খেয়ে নেশায় টং হয়ে গেলে খুন চেপে যেত মাথায়। সেই একবারই আব্বাজান তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মেলায়, পাঁপড় কিনে দিয়েছিল, চুড়ি কিনে দিয়েছিল। তারপর এক গরুর ব্যাপারির কাছে মেয়েকে গচ্ছিত রেখে তাড়ি খেতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। হাসুরও বাড়ি ফেরা হয়নি আর। সে যে বিক্রি হয়ে গেছে। তা বুঝতে সময় লাগেনি বেশি। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেও সে মুক্তি পায়নি। গরুর ব্যাপারি তাকে কোথায় কোন নিরুদ্দেশে নিয়ে গেল। অনেক ঘাট ঘুরে সোনাগাছিতে এসে ঠেকার পর সে মুসাফিরের শেখানো যে গল্পটা শোনাত কাস্টমারদের, তার চেয়ে তার নিজের জীবনের সত্যি ঘটনা কিছুমাত্র কম নিষ্ঠুর নির্দয় নয়, কিন্তু সে কাহিনী বর্ণনা করার মতন ভাষা তার নেই, কারুকে বলতে ইচ্ছেও করে না। যখন তার দু'পা শক্ত হয়েছে, হাতে দুটো পয়সা হয়েছে, তখনও কিন্তু অমন বাবার বাড়িতে তার ফিরে যেতে একটুও সাধ হয়নি। তার পাশের ঘরের শেফালিদিদি, একদিন কথায় কথায় বলেছিল, তারও অমন ধারাই ব্যাপার, সে হিন্দুবাড়ির মেয়ে, সেও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল আরও কম বয়েসে। শেফালিদিদি বলেছিল, বিক্রি করা মেয়েদের কক্ষনও ফিরে যেতে নেই, তা হলে খুন করে ফেলে।

রামমোহন বলে চললেন, ছেলেমেয়েরা ভুলে যায়, কিন্তু বাপ-মা কি ভুলতে পারে? বাপ-মায়ের সব মনে থাকে। তারপর কী হল শোনো, রাত হয়ে গেছে, লম্ফ জ্বলছে দোকানঘরগুলোয়, মেলা প্রায় শেষ, আমি বিকেল থেকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাইনি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে, আর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কান্না, হঠাৎ শুনি কচি গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, বাবা! চমকে উঠে দেখি, এক সাধুর কোলে বসে আছে চন্দন। আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে বুকে নিলুম। সাধুটি বলল, বহুৎ আচ্ছা লেড়কা। কী জানি, সেই সাধু কিছু তুক করেছিল কি না, তারপর থেকেই চন্দন একেবারে শান্ত হয়ে গেল, কক্ষনও রাগে না, মিথ্যে কথা বলে না। আমার নিজের ছেলে বলে বলছি না, চন্দনের মনটা বড় সাদা। ও আপন মনে থাকে, কোনওদিন কারুর ক্ষতি করে না।

রাধা বুঝতে পারছে না, শ্বশুরকে ঠিক কীভাবে খাতির করা উচিত। বাড়িতে মিষ্টিটিষ্টি কিছুই নেই। সকালবেলা একটি ঠিকে ঝি বাসন মেজে, ঘরটর মুছে চলে যায়, তারপর হঠাৎ কিছু জিনিস আনাতে গেলে মুশকিল হয়। রাধা এখনও বাইরে বেরোয়নি। এঁকে কি ভাত খেতে বলা যায়?

সে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কিছু খাবেন? বেলা হয়ে গেছে। টোস্ট আর চা করে দিতে পারি।

রামমোহন বললেন, না, না, আমি কিছু খাব না। দশটার মধ্যে আমার ভাত খাওয়া হয়ে যায়। অবেলায় আর কিছু মুখে দিই না।

রামমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এবার যাব। চন্দনের সঙ্গে দেখা হল না, আর একদিন আসব। মায়ের প্রতিই ওর বেশি টান ছিল আমি জানি। ছেলেরা মনে করে মাই তাদের বেশি ভালোবাসে। বাবা বকাঝকা করে। মাতৃস্নেহ হচ্ছে টলটলে ঝরনার মতন আর পিতৃস্নেহ ফল্গুধারা। ভেতরে চাপা থাকে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এই যে চন্দনকে এতদিন দেখি না, সেজন্য রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

রাধার গলার কাছে যেন বাষ্প জমে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে সে স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছে তার কম বয়েসের জীবনে। এক স্নেহবঞ্চিত বালিকার হৃদয়। পিতৃস্নেহ কাকে বলে জানলোই না। আর চন্দনের জন্য তার বাবা এখনও—

চটি পরতে পরতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবেগকাঁপা গলায় বৃদ্ধ বললেন, মা, তুমি আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও! ওকে তুমি ধরে রেখো না। আমি তো জানি। ও এ জীবন সহ্য করতে পারবে না।

রাধার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

রামমোহন হাত জোড় করে বললেন, মা, আমি তোমার কাছে আমার ছেলেকে ভিক্ষে চাইছি। হয়তো তোমার কোনও দোষ নেই। কিন্তু মানুষ তো তা বুঝবে না। এর মধ্যে চন্দনের চাকরি গেছে। আমি নিজে ওর কম্পানির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেসলুম। সে ভদ্রলোক আমাকে যা-নয়-তাই অপমান করে হাঁকিয়ে দিলে। আমার বংশটাই নাকি পতিত হয়ে গেছে। এর পর চন্দন কোথায় চাকরি পাবে? এ সংসার কী করে চালাবে? শেষ পর্যন্ত কি তাকে তোমার রোজগারে খেতে হবে? চন্দনের চিন্তায় চিন্তায় আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। রাত্তিরে জেগে বসে থাকি। আমার অন্য ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখে না। চন্দনই ছিল আমার ভরসা। খুব বিশ্বাস ছিল, চন্দন আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না। সেই চন্দন, ওঃ ওঃ, এত কষ্ট হচ্ছে!

বৃদ্ধ কাঁদতে শুরু করলেন। তার আগেই রাধার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। দু'জনের কান্নাতেই কোনও খাদ নেই।

চোখ মুছে রামমোহন বললেন, নাঃ, যাই। ওর মায়ের মৃত্যুর পর চন্দন একেবারে ভেঙে পড়েছিল, আমি ওর ঘরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতুম। যেন আমার চেয়ে ওর কষ্ট বেশি। খুব ইচ্ছে করত, ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে। কিন্তু বয়েস হয়ে গেলে ছেলেরা এসব পছন্দ করে না। মনে করে আদিখ্যেতা! তোমার চোখটায় কী হয়েছিল?

রাধা ধরা গলায় বলল, এমনিই লেগেছিল।

রামমোহন বললেন, অন্য রোগ থাকলে চোখ আগে খারাপ হয়। বুঝেছি, তোমার ভাগ্যটাই মন্দ। নিয়তি তোমাকে নরকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মেছ, এ জন্মে তো ওর থেকে আর উদ্ধার পাবে না। প্রার্থনা করো, যাতে পরজন্মে সতীসাধ্বী এয়ো-স্ত্রী হতে পারো। ভালো ঘর-বর পাও, শান্তি-সুখ পাও। এখন যদি চন্দনকে আঁকড়ে থাকো, তুমিও ডুববে, সেও ডুববে। দুজনে সাঁতার না জানলে, এমন কি একজন জেনে আর একজন না জানলে যেমনটি হয়। চন্দন সাঁতার জানে না, আমি জানি। এর মধ্যে ওর চাকরি গেছে, যে বদনামে চাকরি গেছে, তাতে অন্য কোথাও আর কিছু পাবে না, এমনিতেই পাওয়া এত শক্ত। এর পর দেখবে, জানাজানি হয়ে গেলে, এই ফ্ল্যাটেও তোমাদের টিঁকতে দেবে না। তারপর কী দশা হবে, ভগবানই জানেন। আমার এই কথাগুলো মনে রেখো। তারপর যা বিবেচনা হয় কোরো।

আস্তে আস্তে জুতো পরলেন রামমোহন। আর ফিরে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন থপ থপ শব্দে।

রাধা দৌড়ে গিয়ে অন্য জানলাটা খুলল, যেটা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। দুপুরবেলা আবাসনের ভেতরের রাস্তা ফাঁকা। একা একা হেঁটে যাচ্ছেন রামমোহন, পা টেনে টেনে, মাথাটা ঝুঁকে গেছে, কী করুণ একটা মূর্তি!

যতক্ষণ দেখা গেল, সেদিকে চেয়ে রইল রাধা। তারপর বিছানায় আছড়ে পড়ে কান্না শুরু করল, প্রাণ খুলে। দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাধা একটা গরুর মতন কাতরানি মিশে গেল সেই কান্নার সঙ্গে। মাঝে মাঝে বলতে লাগল, না, না, না, আমি ওখানে ফিরে যাব না। যাব না। কেন, কেন, যাব। না, না, না।

রান্না হল না। কিছু খাওয়া হল না। একসময় বৃষ্টি এসে জানলা দিয়ে ভিজিয়ে দিল ঘরের জিনিসপত্র। রাধার হুঁশ নেই।

সেই চুন্নু সাঁইয়ের মেলার শেষে গরুর ব্যাপারির হাতে ধাক্কা খেতে খেতে যাবার সময় রাধা যত কেঁদেছিল, তারপর এতগুলো বছরের মধ্যে এমন কান্না আর কাঁদেনি। মানুষের চোখে এত জলও থাকে?

This Book Downloaded From
http://doridro.com

আঠারো

আজ চন্দনের মেজাজটা বেশ ভালো আছে।

দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে চাকরি পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে, দিন সাতেক আগে একটা নতুন চিন্তা এসেছিল তার মাথায়।

এক সময় অঙ্কের টিউশানি করে তার বেশ সুনাম হয়েছিল। সেটাই তো শুরু করে যেতে পারে আবার। প্রথমে হয়তো বেশি ছাত্র জুটবে না, যদি একজন দু'জনও হয়, তবু তো রোজগার হবে কিছু।

এই মর্মে সে একটি ইংরিজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বক্স নাম্বারে। একটিই যোগ্যতার কথা সে লিখেছিল, গ্যারান্টি দিয়ে অঙ্কে পাস করাবে। আজ দুপুরে সেখানে চিঠির খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছিল, এর মধ্যেই দুটি চিঠি এসে গেছে। আরও আসবে নিশ্চিত।

তার মধ্যে একটি ছাত্র নৈহাটিতে থাকে, সপ্তাহে দু'দিন, মাসে আটশো টাকা। সে চিঠিটা চন্দন ছিঁড়ে ফেলল। ওই অঞ্চলে সে যাবে না।

অপরটি ভবানীপুরের এক টিউটোরিয়াল হোম থেকে, তাদের একজন অঙ্কের শিক্ষক স্টপ গ্যাপ হিসেবে অবিলম্বে দরকার।

অতি উৎসাহে চন্দন বিকেলেই গেল সেখানে দেখা করতে। প্রতিষ্ঠানটি বেশ বড়, স্কুল কলেজের দু'রকম বিভাগই আছে, একটা বাজারের ওপর পাঁচখানা ঘর নিয়ে ক্লাস বসে। টিউটোরিয়ালের মালিক ভদ্রলোক বললেন, আমাদের একজন অধ্যাপক হঠাৎ লম্বা ছুটি নিয়েছেন। তাঁর জায়গায় বলতে গেলে আজ থেকেই একজন লোক দরকার। আপনার ইন্টারভিউ আর কী নেব, এক্ষুনি একটা ইলেভেনের ক্লাস শুরু হবে, পড়াতে চলে যান, তারপর দেখা যাবে।

স্কুলের ছাত্র আর টিউটোরিয়ালের ছাত্র, একই কাঁচা মাল, তবু ব্যবহারের অনেক তফাত হয়ে যায়। স্কুলে মাইনে লাগে না, তাই সেখানে ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, ক্লাসে গোলমাল, যখন তখন স্ট্রাইক কিংবা দারোয়ানের মেয়ের বিয়েতে ছুটির দাবি, এই সবই চলতে পারে। কিন্তু টিউটোরিয়ালে পড়তে আসতে হয় অনেক পয়সা খরচ করে। তাই এখানে কেউ অনুপস্থিত হয় না। ক্লাসের সময় ট্যা-ফোঁ চলে না।

চন্দনের ক্লাসটি নির্বিঘ্নে, শান্তিতে অতিবাহিত হল। চন্দন বেশির ভাগ সময়টাই কাটালো বোর্ডে অঙ্ক কষে।

মালিকমশাই কী বুঝলেন কে জানে। বললেন, আপনি কাল থেকেই শুরু করে দিন। আপাতত সপ্তাহে দুটি ক্লাস, দক্ষিণা এক হাজার। এর পর ক্লাস আরও বাড়লে দক্ষিণাও।

চন্দন এতেই খুশি। একেই বলে শুভ সূচনা।

এ জন্যই আজ ফিরতে একটু দেরি হল। বাস থেকে নেমে দেখল, এক জায়গায় ছোট ছোট ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে। এখনও সিজন শুরু হয়নি, এ সময় ফুলকপির বেশ নতুন নতুন স্বাদ থাকে। গোটা চারেক ফুলকপি আর পাশের দোকান থেকে গরম গরম কাবাব কিনে নিল খানিকটা। রাধা এই কাবাব খুব পছন্দ করে।

কয়েক মাস আগেও পরিচিত কেউ চন্দনকে ফুলকপি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে দেখলে বিস্ময়ে থ হয়ে যেত। চন্দন বাজার করতে কিছু জানে না, গেলেই ঠকবে। সেজন্য কখনও তাকে সে দায়িত্বই দেওয়া হয়নি। কখনও সে বাড়ির জন্য কিছু কিনে নিয়ে যায়নি নিজের থেকে।

এখন সে নিজেই সংসারী। এসব আর তাকে বলে দিতে হয় না।

রাধার চোখের ফুলোটা অনেক কমে এসেছে। দাঁত বসানোও শুরু হবে সামনের সপ্তাহে। তাতে বেশ খরচ আছে যদিও, কিন্তু চন্দন সে জন্য সর্বশান্ত হতেও রাজি আছে। টিউটোরিয়ালে কাজ পাচ্ছে, না খেয়ে তো থাকতে হবে না।

টিউটোরিয়ালে তার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না তো? অফিসেই যদি নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তো খুব বেশিই উঠতে পারে। শিক্ষকদের সবাইকেই তো খুব পুত চরিত্রের আদর্শবাদী হতে হয়। এসব ভেবে চন্দন মনে মনে হাসল। যাক, পরে কী হয় দেখা যাবে!

বাইরে থেকে কয়েকবার কলিং বেল বাজিয়েও চন্দন সাড়া পেল না। রাধা বাথরুমে থাকতে পারে। তা হলে আর দরজা খুলবে কী করে। এরকম হয়েছে কয়েকবার। দুটে চাবি আছে বটে, কিন্তু চন্দন নিতে ভুলে যায়।

একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল।

ভেতরে পা দেওয়া মাত্রই চন্দন বুঝতে পারল যে ফ্ল্যাটটি শূন্য। এটা বোঝা যায়। বাথরুমের দরজা দেখার দরকার হয় না।

রাধা তা হলে আজই প্রথম বাইরে গেল!

এর আগে চন্দন তাকে নিয়ে দু'-একদিন বেরুতে চেয়েছিল, রাধার খুব হিন্দি সিনেমা দেখার অভ্যাস, তা সে দেখবে না কেন? কিন্তু রাধাই রাজি হয়নি। এক দিকের ফোলা চোখ সে বাইরের লোকেদের দেখাতে চায় না।

কার সঙ্গে গেল রাধা? সোনাগাছির মেয়েরা সব দুপুরে সিনেমা দেখে। সন্ধেবেলা তাদের কাজের সময়, যেমন অন্যদের অফিসের সময় হয়, সে সময় তাদের বাইরে থাকা চলে না। অপিস বাবু-বিবিরা তবু ছুটি নেয়, কিংবা ফাঁকি দেয়, এইসব মেয়েদের সে উপায়ও নেই, তাদের যে হাতে হাতে রোজগার।

তবে কি দুর্বারের কোনও দিদির সঙ্গে গেল? ওই মহিলাদের বেশ কয়েকজন বয়েসে ছোট হলেও রাধারা সবাইকে দিদি বলে। কী জানি কেন বলে।

রাধা একাও যেতে পারে। তার চোখ তো প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এর পর দাঁতও ঠিক হয়ে যাবে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে যাবে আগের মতন। মাঝখানের দুঃস্বপ্নটা কেটে যাবে। তারপর রাধা লঘু পায়ে ঘুরবে। আপন মনে হেসে উঠবে। তখন চন্দন তাকে খুব আদর করবে। সে সম্ভাবনার কথা ভাবলেই চন্দনের রোমাঞ্চ হয়।

ইভনিং শো শেষ হল সোওয়া আটটায়। এ পাড়ার কাছাকাছি দুটি সিনেমা হলে একটাতে হিন্দি আর অন্যটাতে চলছে বাংলা ছবি। চন্দনের যে ফিলমের ব্যাপারে খুব উৎসাহ আছে তা নয়। কিন্তু যাওয়া-আসার পথে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া অক্ষরে লেখা, মোটা মোটা ছবির সাইন বোর্ড তো চোখে পড়েই।

চন্দন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর একটা খণ্ড কিনেছে, সেটা পড়ছিল। হঠাৎ এক সময় তার খেয়াল হল, রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

চন্দনের সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল।

চন্দনের যদি বাস্তব বুদ্ধি আর একটু বেশি হত, তা হলে সে আরও আগেই খোঁজখবর নিত।

রাধা সোনাগাছি ছেড়ে আসার সময় আর কিছু আনেনি, শুধু একটা ব্যাগ ছাড়া। সেটা আছে কি না তা দেখে নিতে পারত অন্তত।

না, সে ব্যাগটা নেই।

ড্রয়ারে চন্দনের যা টাকাপয়সা ছিল, তা ঠিকই আছে। শুধু রাধার সেই ব্যাগটাই দেখা যাচ্ছে না।

চন্দন তবু বেরিয়ে প্রথমে দেখতে গেল। সিনেমা হলটার সামনে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে কি না। সেখানে সবই শান্ত। শুরু হয়ে গেছে নাইট শো।

তবে কি রাধা হঠাৎ উতলা হয়ে গেছে তার পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য? চন্দন একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল সোনাগাছিতে।

গেটের কাছে চেয়ারের ওপর বাবু হয়ে বসে থাকা সেই লোকটি হাসি মুখে বলল, নমস্কার জামাইবাবুজি। হাল-চাল সব ঠিক আছে তো!

চন্দন তার সঙ্গে কোনও কথা না বলে উঠে এল দোতলায়।

নির্দিষ্ট জায়গাটায় বসে আছে মুসাফির। যথারীতি তার হাতে রাম ভর্তি গেলাস।

আজ বাজার ভাল, বেশির ভাগ দরজাই বন্ধ, শুধু একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসাফিরের পাশে। তার নাম চামেলি, দিন দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মুখখানা থেকে যেন নিঙড়ে নেওয়া হয়েছে সব জীবনরস।

মুসাফির কিছু বলার আগেই চন্দন জিজ্ঞেস করল, রাধা কোথায়?

মুসাফির যেন তেমন অবাক হল না। ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, উড়ে গেছে? পাখি উড়ে গেছে?

চন্দন আবার জিজ্ঞেস করল, সে এখানে আসেনি?

দু'দিকে মাথা নাড়ল মুসাফির।

আপনি ঠিক জানেন?

রাধা ফিরবে, আর আমি জানব না? আমিই তো আয়ান ঘোষ তো।

চন্দন তবু বারান্দার শেষ ঘরটার কাছে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর অন্য একটি মেয়ে অধখানা শাড়া একটু

ফাঁক করে বলল, ঘরে লোক আছে। যাও, যাও—।

চন্দন আবার ফিরে এসে মুসাফিরকে জিজ্ঞেস করল, রাধা তা হলে কোথায় গেছে?

সঙ্গে কিছু নিয়ে গেছে?

না।

কিছু না?

শুধু ওর ব্যাগটা।

ও, তবে তো বোঝাই গেল, কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি। ঝগড়া হয়েছিল?

না।

চামেলি বলল, মরণ! কথায় বলে না, কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না! অমন দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট ছেড়ে কেউ যায়? এর এমনধারাই স্বভাব!

মুসাফির একটু সুর করে গেয়ে উঠল, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, ক্যামনে আসে যায়! ওগো ব্রাদার, মনোবেড়ি দিয়ে বাঁধতে না পারলে এসব পাখি থাকে না।

চন্দন প্রবল অভিমানের সঙ্গে বলল, আপনি এখন আমাকে এইসব বলছেন? রাধাকে খুঁজে পাব না!

চামেলি বলল, এ পাড়ার অন্য বাড়িতে উঠেছে কি না, নকুড়কে দিয়ে খোঁজ করতে পাঠাও না! ততক্ষণ এসো বাবু, আমার ঘরে এসে বসো না। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, জলটল খাবে এসো—।

চন্দন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

মুসাফির বলল, না রে। ও অন্য কারুর ঘরে যাবার মানুষ নয়। বড্ড এক বগ্গা। বেরসিক। এ পাড়ায় অন্য কোনও বাড়িতে রাধা আসেনি, তা হলে এতক্ষণ মুখে মুখে রটে যেত। দালালরা সব খবর রাখে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, খোঁজ তো করতেই হবে। পাওয়া যাক বা না যাক, খোঁজ না-করাটা নিজেরই অপমান। এই মেয়ে একবার শেফালিকে ডাক তো।

চামেলি বলল, এখন ডাকবে কী গো? শেফালির ঘরে বাঁধা বাবু আছে।

মুসাফির বলল, জানি, জানি। সে তো এখন শুধু বসে বসে মাল খাচ্ছে। আমার নাম করে শেফালিকে ডাক। ঠিক আসবে।

সত্যিই মুসাফিরের নাম শুনে শেফালি বেরিয়ে এল। সে পুরো শালোয়ার কামিজ পরা।

মুসাফির বলল, রাধা এই বাবুটিকে ছেড়ে চলে গেছে। তুই কিছু জানিস?

শেফালিই প্রথম সত্যিকারের অবাক হল খবরটা শুনে।

সে বলল, সে কী গো! আমার সঙ্গে পরশু দিনকেও দেখা হয়েছে, দুপুরে ওর ওখানে খেয়ে এলুম। আমায় কিছুটি বলেনি তো! কী হয়েছিল!

চন্দন বলল, কিছু না।

শেফালি বলল, পোড়া কপাল!

মুসাফির বলল, কোথায় যেতে পারে, তুই কিছু বলতে পারিস?

শেফালি বলল, না! যত দূর জানি, ওর তো চেনা আর কেউ নেই। আমায় সব কথা বলে।

মুসাফির বলল, তোর ঘরে তো মল্লিকবাবু রয়েছে। হোল নাইট থাকবে, তাই তো? ওর গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার নাম করে জিজ্ঞেস কর তো, ঘণ্টা দু-একের জন্য গাড়িটা নিয়ে ঘুরে আসতে পারি কি না। গাড়ির নম্বরটা জিজ্ঞেস করিস।

চন্দন বলল, আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারি।

মুসাফির বলল, দাঁড়াও না, কেন শুধু শুধু টাকা খরচ করবে? সে টাকায় মাল খেলে কাজে লাগে।

শেফালি ঘুরে এসে বলল, হ্যাঁ, বলেছে যেতে পার। গাড়ি কাছাকাছি নেই, পার্কের ওপাশে, সাদা রং, ড্রাইভারের নাম ইউনুস। ভাইদাদা, তুমি যেন আবার অন্য কোথাও হোল নাইট কোরো না।

তার মাথায় একটা আলতো চাঁটি মেরে মুসাফির বলল, দূর পাগলি! ঠিক দু'ঘণ্টা পরে গাড়ি ফেরত দেব।

চন্দনকে নিয়ে মোড়ের মাথায় কয়েকজন দালালের সঙ্গে কথা বলল মুসাফির। পানের দোকান থেকে নিল একটা রামের পাঁইট।

গাড়িটা খুঁজে নিয়ে উঠে পড়ার পর বলল, রাধা যে এ-পাড়ায় আসেনি, তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। দালালদের চোখ এড়িয়ে কারুর যাবার উপায় নেই। তুমি ট্যাক্সি ভাড়া করবে বলছিলে, এই পাঁইটটা ধারে এনেছি। একশো বিশ টাকা দিয়ে দিও।

ছিপি খুলে খানিকটা কাঁচা রাম সে ঢালল গলায়।

গাড়িটা প্রথমে এল কালীঘাটে। এখানে যে একটি বারাঙ্গনা পল্লী আছে, সে জানত না।

মুসাফির এখানেও প্রথমে কথা বলল কয়েকটি দালালের সঙ্গে। তারপর একটা জীর্ণ দোতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, রাধা একেবারে প্রথমে এখানে ছিল। আমাকে বলেছে। আমাকে তো ওরা সব কথাই বলে।

দোতলার একটি ঘরে পা ছড়িয়ে বসে আছে এক অত্যন্ত স্থূলকায় রমণী। সামনে পানের বাটা আর সিনেমার পত্রিকা।

আগন্তুক দু'জনকে দেখে সে রমণী বলল, কী চাই? আজ কোনও ঘর খালি নেই। কাল এসো।

মুসাফির বলল, আমরা ঘরের জন্য আসিনি। মাসি, তোমার মনে আছে, হাসু নামে একটা রোগা মতন মেয়ে তোমার এখানে থাকত? তার কোনও খোঁজ রাখো?

মাসি বলল, যে চলে গেছে, তার খোঁজ রাখতে যাব কোন্ দুঃখে? যারা আসে, আমি তাদের খপর রাখি।

নতুন কেউ এসেছে?

তোমাদের কোনও মেয়ে হারিয়েছে? থানায় যাও না, আমার কাছে কেন? আমি কোনও বে-আইনি কাজ করি না। কম বয়সের মেয়েও রাখি না।

এর বয়েস খুব কম নয়।

যাও ভাগো। এখানে নতুন কেউ নেই।

ফিরে আসতে আসতে মুসাফির বলল, দালালরা আগেই বলেছে, আজ-কালের মধ্যে কেউ আসেনি।

এর পর বউবাজার।

একই পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে কোনও ফল মিলল না। একজন দালাল একটি নতুন মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গেল, সে নেপালি।

গাড়িতে উঠে মুসাফির বলল, আর কোথায় খুঁজবে বলো! সারা শহরে আরও ছোটখাটো এরকম অনেক পল্লী আছে। এমন কি ভদ্র পাড়াতেও, সানগ্লাস পরা, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখা, ইংরিজি বলা মহিলারাও প্রাইভেট ব্রথেল চালায়। আমি লক্ষ করেছি, যে-সব মেয়েরা একবার ইনহিবিশান কাটিয়ে উঠতে পারে, তাদের কাছে সেগুটা একেবারে জল-ভাত!

গলায় আবার রাম ঢেলে সে বলল, ওকে আর খুঁজে পাবে না। যে নিজের ইচ্ছেতে চলে যায়, তাকে ধরা প্রায় অসম্ভব। সত্যি বলছ, ঝগড়া হয়নি!

চন্দন বলল, একটুও কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি।

মুসাফির বলল, তবুও কোথাও হয়তো লেগেছে, বোঝা যায় না। মানুষের মনের মধ্যে একটা অজানা দেশ আছে, সেখানকার নিয়মকানুন সব আলাদা, বাইরের সঙ্গে একেবারে মেলে না। আমরা বুঝতেও পারি না। তোমায় একটা কথা বলি ব্রাদার, এবার ওর আশা ছাড়ো। রবি ঠাকুরের একটা গান আছে, যে-ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে। প্রকৃতির নিয়মই এই। কিছু কিছু ফুল ঝরে যাবেই, তবু ফুল ফুটতেই থাকে, কোনও শূন্য স্থান থাকে না। যারা যায়, অন্যরা এসে তাদের জায়গা নিয়ে নেয়।

চন্দন বিরক্তভাবে বলল, আপনি কি ফিলোজফার? আপনার এই ফিলজফি আমি মানি না।

মুসাফির বলল, না, না আমি আবার কোন্ পেনো ফিলোজফার! আমি বেশ্যা বাড়ির অন্নদাস, সব মানুষই অন্নদাস, তবু স্বীকার করে না। তাতে মান যায়! আমি এদের মধ্যে যে কী আনন্দে আছি! কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই! আসল ফিলোজফার কে জানো? ওই কালীঘাট পাড়ার মাসি। যে বলল, যে চলে গেছে তার খোঁজ রাখতে যাব কোন্ দুঃখে! যারা আসে, আমি তাদের খপর রাখি!

চন্দন বলল, আপনাকে মেয়েরা খেতে দেয় কেন? আপনার কথা সবাই মানে কেন?

মুসাফির হেসে বলল, তার কারণ, আমি যে ওদের ক্ষতস্থানে একটু মলম লাগিয়ে দিই। তাও যে লাগাবার কেউ নেই। ওই যে চামেলিকে দেখলে, ও আর বেশিদিন বাঁচবে না। ওকে মৃত্যুরোগে ধরেছে। আমি ওর সঙ্গে রোজ দু'টো মিষ্টি কথা বলি, যাতে শেষের দিনকটায় অন্তত একটু হেসে যেতে পারে।

এরপর দিনের পর দিন চন্দন সারা শহর এফোঁড়-ওফোঁড় করে খুঁজেছে, কিন্তু একেবারেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে রাধা।

চন্দন টিউটোরিয়ালে জয়েন করেনি, সে কিছুই করে না। ছ' মাস প্রায় হয়ে এলো, এরপর তাকে হয়তো ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে। তারপর কী হবে, সে জানে না।

এর মধ্যে আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে রামমোহনের। দিবাকর দু'খানা খবরের কাগজে বড় করে বাবার শ্রাদ্ধের দিনের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল, ছবি সমেত। চন্দনের তা চোখে পড়েছে, তবু সে যায়নি।

লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখটায় একদিন হঠাৎ মুকুলিকার সঙ্গে দেখা।

বলাই বাহুল্য, চন্দন নিজে দেখতে পায়নি, সে হাঁটছিল উদ্দেশ্যহীনভাবে। সঙ্গে এক গাদা জিনিসপত্রের প্যাকেট, ট্যাক্সি ডাকতে থমকে গিয়ে সে ডাকল, চন্দন।

তারপর তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী শুনতে পাচ্ছ না, তোমায় ডাকছি।

আজও দুর্দান্ত সেজেছে মুকুলিকা। তার তুলনায় চন্দনের শার্টটা মলিন, পায়ে স্যান্ডেল, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি।

মুকুলিকা বলল, জানতুম, তোমার সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই। ভালোই হল, আমি দিল্লি চলে যাচ্ছি, আবার কবে ফিরি না-ফিরি। মা খুব বলে তোমার কথা। মুখে ওরকম বিচ্ছিরি দাড়ি কেন?

হ্যাঁ, কয়েকদিন কামানো হয়নি। আজই

তোমার বউ আপত্তি করে না?

আমার বউ...আমার সঙ্গে থাকে না।

থাকে না মানে? আলাদা থাকে?

তা জানি না।

জানো না মানে, সে চলে গেছে। ইস, শুনে খুব খারাপ লাগল। তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলে

এক্সপেরিমেন্ট তো করি নি। তাকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি।

তবু ধরে রাখতে পারলে না?

পারিনি। আমারই দোষ নিশ্চয়ই।

ভেরি স্যাড। তা বলে কি দিওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াবে নাকি? নর্মাল হও। নর্মাল হও।

দাড়ি না কামালেই কি অ্যাবনর্মাল হয়? তুমি দিল্লি যাচ্ছ কেন?

মুকুলিকা খিলখিল করে হেসে ফেলে বলল, কী ভাগ্য আমার, তবু তুমি নিজের থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে! এই প্যাকেটগুলো একটু ধরো, আঁচলটা ঠিক করে নিই। আমার বেশি সময় নেই, ট্যাক্সি ধরতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?

চন্দন মাথা নেড়ে বলল, না।

মুকুলিকা বলল, তোমার না মানে না। হাঁ করানো যাবে না। জঙ্গিপুরে আমি একটা কলেজে মাস্টারি করছিলাম, সেখানে আর টেকা গেল না। দিল্লিতে ভালো চাকরি পেয়েছি। তোমার সেই টার্নার রোডের ফ্ল্যাটটার কথা মনে আছে। সেই যেদিন ট্রেনে গণ্ডগোল হয়েছিল?

চন্দন বলল, ফ্ল্যাটে তো ঢুকিনি। সিঁড়িতে

সেদিন তুমি আমায় দারুণ অপমান করেছিলে। বলতে গেলে সেদিন থেকেই আমার জীবনটা বদলে গেছে। জঙ্গিপুরে আমার কলিগরা সেখানে আমায় কী নাম দিয়েছিল জানো? নরখাদক। আসলে নরখাদিকা। আমি সত্যিই পুরুষ মানুষদের ঘাড় মটকে মটকে খাই। বাঘিনীর মতন তাদের রক্ত চুষে নিই। অনেককে খেয়েছি। তোমাকেও খেতে চেয়েছিলুম। জানো তো, যে শিকারটা ফস্কে যায়, তার জন্যই বেশি আফসোস থাকে। সেইজন্যই তোমার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।

তুমি পুরুষ মানুষদের সঙ্গে...তুমি বুঝি ভালোবাসা চাও না?

তুমি তো ভালোবাসা চেয়েছিলে? কী লাভ হল তাতে? ধরে রাখতে পারলে?

This Book Downloaded From
http://doridro.com

আমি পারিনি। কিন্তু এই যে রাস্তা দিয়ে এত মানুষ যাচ্ছে, এদের জীবনে কি ভালোবাসা নেই? সুখ নেই, নিশ্চয়ই আছে, এত মানুষ, সংসারগুলো তাহলে কীসের ওপর টিকে থাকে?

কী জানি। সবাই ভালোবাসার মানেটাই জানে কি না। আমি তা জানতে চাই না। ভালোবাসা ছাড়াও ভোগ-সুখ নিয়ে দিব্যি বেঁচে থাকা যায়।

শুধু ভালোবাসা নিয়েও কী বেঁচে থাকা যায় না? যাকে ভালোবাসলে সে উত্তর দিল না, কিংবা ছেড়ে চলে গেল, তবু কি ভালোবাসাটা থেকে যেতে পারে না?

অনেক কথা বলতে শিখেছ দেখছি। তুমি এর উত্তর খোঁজো, আমি চললুম।

চন্দন যখন খোঁজাখুঁজিতে ক্ষান্তি দিয়েছে, গালে দাড়ি জমায় না, তারপরেই রাধার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল তার।

দুর্বারের মহিলারা তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। তারাও রাধার সন্ধান পাওয়ার জন্য কম চেষ্টা করেনি। চন্দনকে ডেকে ডেকে তারা নিজেদের প্রজেক্টে কিছু কিছু সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছে, চন্দন তেমন একটা মনোযোগ দিতে পারেনি।

ওদের উদ্যোগে একটা বার্ষিক উৎসব হয় খুব বড় আকারে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে। এর নাম শান্তি উৎসব। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি এখানে ঠিক নিজেরা নেতৃত্ব দেয় না, সহায়তা করে, সামনে এগিয়ে আনে কিছু যৌনকর্মীকে। তারাই সভা পরিচালনা করে, কেউ কেউ দিব্যি বক্তৃতাও করে বাংলা কিংবা হিন্দিতে।

চন্দন আগে জানত না যে যৌনকর্মীদের এরকম সম্মেলন পৃথিবীর অনেক দেশে হয়, এ দেশ থেকেও প্রতিনিধিরা যায়। কলকাতার মেলাটাও খুব উল্লেখযোগ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, এদিকে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া থেকে এসেছে যৌন কর্মীরা।

বিশাল আয়োজন, বক্তৃতা সেমিনার যেমন আছে, তেমনই ওদের হাতের কাজের প্রদর্শনী, দোকানপাট, খেলাধুলোর ব্যবস্থা। যাদের মনে করা হয় অন্ধকারের জীব, ঘৃণা দিয়ে যাদের ঠেলে রাখা হয় আড়ালে, তারা এসে পড়েছে প্রকাশ্যে, শীতের নরম রোদ্দুরে, তারা স্বাভাবিকভাবে হাসছে, খেলছে, ছুটোছুটি করছে। সংখ্যায় তারা কয়েক হাজার, অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে পোস্টার, 'আমরা গতর খাটিয়ে খাই, শ্রমিকের অধিকার চাই'।

দুর্বারের মহিলাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে চন্দন এই মেলায় আসতে বাধ্য হয়েছে।

সমাজের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, খবরের কাগজে যাদের প্রায়ই নাম দেখা যায়, তাঁরা মঞ্চে উপস্থিত। বিশিষ্ট লেখিকা শান্তিশিখা মজুমদার বক্তৃতা করছেন দেখে চন্দন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু শুনল, তারপর সরে গেল।

তার বিশেষ কিছু দায়িত্ব নেই, সে দেখছে ঘুরে ঘুরে।

এক সময় সে দেখতে পেল রাধাকে।

রাধা কি তাকে দেখেই চট করে চলে গেল একটা দোকানের আড়ালে?

চন্দন দৌড়ে তাকে ধরতে গেল না। একবার ডাকলোও না।

সে দাঁড়িয়ে রইল একটা গাছের নীচে।

আবার দেখা গেল রাধাকে, আবার সে সরে গেল।

চন্দন ডাকবে না। এবার রাধাকে নিজে থেকে আসতে হবে। আসতে চায় আসবে। না চাইলে না আসুক।

রাধা যেন একেবারে পালিয়ে যেতেও পারছে না। কৌতূহলী বালিকার প্রথম ট্রেন দেখার মতন, নানান জায়গা থেকে উঁকি মেরে দেখছে চন্দনকে। না, চন্দন কিছুতেই তাকে ডাকবে না।

এই সময় হুড়মুড় করে শুরু হল বৃষ্টি। শেষ শীতের অকালবৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা। যারা উন্মুক্ত স্থানে ছিল, তারা দৌড়দৌড়ি করে চলে গেল দোকানগুলোর মধ্যে কিংবা শামিয়ানার নীচে।

শুধু একা চন্দন দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। ভিজতে লাগল বৃষ্টিতে। বৃষ্টিতে সে ঝাপসা হয়ে গেল।

This Book Downloaded From
http://doridro.com